গ্রহে উপগ্রহে

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রহে উপগ্রহে

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

রত্নসাগর গ্রন্থমালা

রত্নসাগর গ্রন্থমালা—১৫
প্রথম প্রকাশ
১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪
প্রকাশক
দেবকুমার বসু
৭ জে, পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা-২৯
চিত্রকর্ম
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
বর্ণলিপি
চারু খাঁ
মুদ্রক
শ্রীগৌরচন্দ্র পাল
নিউ শ্রীদুর্গা প্রেস
২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
প্রচ্ছদ মুদ্রণ
মোহন আর্ট প্রেস
পরিবেশক
গ্রন্থজগৎ
৬, বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১২
—দেড় টাকা—

বাংলা ভাষার প্রসার ও সমৃদ্ধির জন্য বাংলা ভাষায় বহুবিধ পুস্তক প্রকাশ ও প্রচারের প্রয়োজন। বহুবিধ বিষয়ে নানা পুস্তক ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করাই এই "রত্নসাগর গ্রন্থমালার" উদ্দেশ্য। সকলই রত্ন যাহা মন ও জীবনকে সারবান করে। গ্রন্থগুলি এই কাজে সাহায্য করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

সম্পাদক—দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
মনোজ ভট্টাচার্য
দেবকুমার বসু

মহাকাশ জয়ের আকাঙ্খা মানুষের চিরন্তন। বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞান গবেষণা কি ভাবে মানুষের এই মহা আকাঙ্খাকে বাস্তব রূপ দিতে এগিয়ে যাচ্ছে, তারই এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ 'গ্রহে উপগ্রহে'র বিষয়বস্তু। বইটির বিভিন্ন অংশ স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রবন্ধরূপে আমার নামে ও ছদ্মনামে মাসিক বসুমতী, পরিচয় ইত্যাদি পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছে। রচনাকাল ১৯৫৬ সাল।

বইটি সম্পূর্ণ কম্পোজ এবং কিছু অংশ ছাপা হয়ে যাবার পর রাশিয়ার কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশ পরিক্রমণ করতে শুরু করেছে। পরিশিষ্টে তাই কৃত্রিম উপগ্রহগুলির বিষয়ে কিছু আলোচনার অবতারণা করেছি।

আশা করি বইটি পাঠকদের কৌতূহল মেটাতে সক্ষম হবে।

১২।৩ অশ্বিনী দত্ত রোড বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা-২৯
১১।১১।৫৭

পরম পূজনীয়

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

রত্নসাগর গ্রন্থমালার গ্রন্থাবলী

১।	কোন ব্যাঙ্কে টাকা রাখবো—রবীন্দ্রনাথ ঘোষ	১৲
*২।	বাঘ ও অজন্তা—দেবব্রত মুখোপাধ্যায়	১॥০
*৩।	ইরাণের শিল্প ও সংস্কৃতি—গুরুদাস সরকার	৩৲
৪।	রবীন্দ্র কথা—বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	১৲
*৫।	বাংলার লোকশিল্প—রবীন্দ্র মজুমদার	১।০
৬।	বাংলা সাহিত্য পরিচয়—তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	২॥০
৭।	ব্যঞ্জনা ও কাব্য (১ম)—হরিহর মিশ্র	২৲
*৮।	রঙ ও রূপ—ডাঃ সচ্চিদানন্দ কুমার	২৲
৯।	ভারতের ধনতান্ত্রিক বিকাশের ভূমিকা—প্রিয়তোষ মৈত্রেয়	৩৲
*১০।	য়ুরোপে আধুনিক চিত্রকলার প্রগতি— অর্দ্ধেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায়	৩৲
১১।	ব্যঞ্জনা ও কাব্য (২য়)—হরিহর মিশ্র	২৲
*১২।	রূপকার নন্দলাল—শান্তিদেব ঘোষ	২॥০
*১৩।	আমার কথা—কথক ঃ ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ অনুলেখক ঃ শুভময় ঘোষ	১॥০
১৪।	বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি—প্রিয়দারঞ্জন রায়	২৲
১৫।	গ্রহে উপগ্রহে—বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	১॥০
*১৬।	বাংলা নাটক—দেবকুমার বসু সম্পাদিত	২৲
১৭।	ব্যঞ্জনা ও কাব্য (৩য়)—হরিহর মিশ্র	২৲

* চিহ্নিত বইগুলি সচিত্র।

গ্রহে উপগ্রহে

১

বিজ্ঞান-সভ্যতার প্রথম অঙ্কুরেই মানুষের চিত্ত উদ্বেল হয়ে উঠেছিল আকাশ-জয়ের আকাঙ্ক্ষায়। মানুষ কল্পনা করত যদি কোনোক্রমে একবার আকাশে উঠতে পারে তাহলে যে অচিরেই মহাশূন্য অতিক্রম করে চন্দ্রপৃষ্ঠে, অথবা শূন্যচারী যে কোনো নতুন জগতে অবতরণ করবে। মধ্যযুগের সীমাবদ্ধ জ্ঞানভাণ্ডারের সাহায্যে সীমাহীন বিশাল মহাকাশের চিন্তা করাও তাদের পক্ষে অসাধ্য ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের এই চিন্তাধারার হল পরিবর্তন, মানুষ জানল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যেই তারা জীবনধারণ করতে সমর্থ আর বিশাল বিশ্বের বিস্তৃত মহাকাশের তুলনায় এ-অঞ্চলের পরিধি এতই নগণ্য যে গ্রহান্তরে যাত্রার চেষ্টা বাতুলতা ছাড়া কিছুই নয়। মানুষ আরও জানল, পৃথিবী সমস্ত বিশ্বের কেন্দ্র মণি নয়, সৌরজগতের এক নগন্য গ্রহরূপে সে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে আর সূর্যের বুকে চলেছে অগ্নিদেবতার তাণ্ডবলীলা, তখন সে তার পূর্বপুরুষদের সূর্যজয়ের অবাস্তব স্বপ্নকে করলো পরিত্যাগ।

হাওয়ার বুকে ভাসল বেলুন। হাওয়ার চেয়েও অনেক ভারি মানুষ সেই বেলুনে চড়ে আকাশপথে পাড়ি দিল। বিজ্ঞান-গবেষণার অসামান্য ফলস্বরূপ আবিষ্কার হল উড়োজাহাজের, আর নতুন করে মানুষের মনে জাগলো মহাশূন্যজয়ের চিরপুরাতন স্বপ্ন। বিজ্ঞান-সাধনার প্রসাদে আজ আর সে উপলব্ধির জগতে পেছিয়ে নেই, বিশ্বজগতের বিশ্বরূপের সঙ্গে পাতিয়েছে আত্মীয়তা। মহাশূন্যের বুকে, গ্রহে উপগ্রহে যাত্রা করার আগেই সে যুক্তি-জালের সাহায্যে সন্ধান করে নিতে পারে মহাকাশের কোন অঞ্চলে তার জন্য কোন মহাবিপদ অপেক্ষা করছে, কি তার সম্ভাব্য প্রতিকারের উপায়? বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই কয়েকজন বিজ্ঞানী সাম্প্রতিক আবিষ্কারসমূহের জ্ঞান ও চিন্তাধারাকে কাজে লাগিয়ে মহাশূন্য-বিজয়ের সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন। রকেট তখন সবে আবিষ্কৃত হয়েছে। রুশ বিজ্ঞানী জিওলকোভ্স্কি সর্বপ্রথম রকেটের ব্যবহারে মহাশূন্যে পরিভ্রমণের সমস্যা সমাধানেরর চেষ্টা করলেন। কিন্তু

বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মানুষের মহাশূন্য-বিজয়ের সাধনার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব একসঙ্গে দুজন বিজ্ঞানী দাবি করতে পারেন। তাঁরা যথাক্রমে রুমানিয়ার হার্‌মান ওবার্থ এবং আমেরিকার রবার্ট গডার্ড।

বিজ্ঞান-সভ্যতার অগ্রগতির যুগে সর্বপ্রথম মহাশূন্য-জয়ের চেষ্টা করার জন্য আমরা গডার্ড ও ওবার্থ উভয়েরই কাছে ঋণী। গডার্ড ছিলেন ফলিত-বিজ্ঞানী,—হাতে-কলমে তিনি এ বিষয়ে কাজ করে গেছেন; আর ওবার্থের গবেষণার বিষয়বস্তু হলো গণিতের নির্ভুল সহায়তায় মহাশূন্য পরিভ্রমণ সমস্যার সমাধানের চেষ্টা।

রবার্ট গডার্ড ১৯১৫ সাল থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অতি-উচ্চাকাশ বিজয়ের চেষ্টায় অজস্র রকম রকেটের নক্সা প্রস্তুত করেছেন এবং তিনিই ১৯২৬ সালে তরল জ্বালানি-সমন্বিত রকেট সর্বপ্রথম ম্যাসাচুসেট্‌স থেকে ছুঁড়ে মহাকাশে প্রেরণ করেন। চন্দ্র বা কোন গ্রহ বিজয়ের চিন্তায় গডার্ড এ গবেষণা করেন নি,—অতি উচ্চে মহাকাশের বক্ষদেশে থেকে, বায়ুমণ্ডল বিষয়ে গবেষণা করাই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

গ্রহে উপগ্রহে যাবার আশা যে তিনি করতেন না তা নয়। গডার্ড উপলব্ধি করেছিলেন উচ্চাকাশ ভ্রমণের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ব-জগতের অপরূপ এক সাম্রাজ্য মানুষের সামনে খুলে যাবে। একটি রচনায় তিনি চন্দ্রে পৌঁছুবার জন্য রকেটের কি আয়তন হওয়া উচিত তাও আলোচনা করেছিলেন, কিন্তু গডার্ড গ্রহান্তরে যাত্রা বিষয়ে কোন মন্তব্য করেন নি।

গণিত-বিজ্ঞানী হার্‌মান ওবার্থের চিন্তাধারার প্রবাহ ছিল অন্যদিকে। ১৯২৯ সালে প্রকাশিত 'মহাশূন্য পরিভ্রমণের উপায়' নামক একটি পুস্তকে তিনি গ্রহান্তরে যাত্রার সমস্যাগুলি গণিত-বিজ্ঞানের সাহায্যে বিস্তারিত-ভাবে আলোচনা করেন। ঐ পুস্তকে শূন্যযান পরিকল্পনার নক্সা এবং মহাশূন্যে ভ্রমণের যান্ত্রিক সমস্যাসমূহের সমাধানের চেষ্টাও করা হয়েছিল। ওবার্থের রচনায় অনুপ্রাণিত হয়েই ঐ সময়ে জার্মানীতে মহাশূন্য পরিভ্রমণের জন্য একটি সমিতি গঠিত হয়েছিল এবং কয়েক বছর ধরে ঐ সমিতির সদস্যরা মহাকাশে রকেট প্রেরণ বিষয়ে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ-মূলক অনেক গবেষণা চালিয়েছিলেন।

গত মহাযুদ্ধের পরে দেখা গেল মানুষের মহাশূন্য বিজয়ের চেষ্টা আরও অনেক অগ্রসর হয়েছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে গোপনে গোপনে সব প্রাধান্যকামী জাতিই রকেট ও বিবিধ শূন্যযানের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ফলস্বরূপ আবিষ্কৃত হল প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী ভি-২ এবং সমপর্য্যায়ের অন্যান্য প্রচণ্ড শক্তিশালী শূন্যযানসমূহ। মানুষের হাতে অসীম শক্তিভাণ্ডার তুলে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করল পরমাণু-শক্তি, —বিজ্ঞানী ও তৎসঙ্গে সর্ব্ব-সাধারণের মনে আশা জাগল, এবার বোধ হয় মহাশূন্য বিজয়ের শুভলগ্ন দেখা দিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মানুষ হাওয়ায় ভাসবার জন্য যে ভাবে আপ্রাণ চেষ্টা করছিল, আজকের দিনে সে ঠিক তাই করছে মহাশূন্য-জয়ের প্রচেষ্টায়; জানি নে পূর্ববর্তী সাধনার মতো এই প্রচেষ্টা কবে সাফল্যমণ্ডিত হবে। তবে সাধারণভাবে বিজ্ঞানীমহল এই ধারণা পোষণ করেন যে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই মানুষ নিকটবর্তী উপগ্রহে অবতরণ করতে সমর্থ হবে।

আগামী ভবিষ্যতে মহাকাশ-বিজয়ের পরিকল্পনায় মানুষের কল্পনা কতোদূর সম্পূর্ণতা লাভ করবে তা বলা কঠিন। তবে বিখ্যাত বিজ্ঞানী ফ্রিটস্ জোয়াইকির মতে পরমাণু যন্ত্রবিজ্ঞানের সহায়তায় মানুষ অন্যান্য গ্রহ অথবা উপগ্রহকে অক্লেশেই তার জীবনের উপযোগী করে নিতে পারবে। কেবলমাত্র তাই নয়, প্রয়োজন হলে তাদের নিজ কক্ষপথ পরিত্যাগ করতেও বাধ্য করবে! অথচ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিশ্ব-জগতের যে নগ্ন স্বরূপ আমাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করেছে, সাধারণ বিবেচনায় তার কোন অঞ্চলই মানব-সভ্যতার উপযোগী নয়। কোথাও প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, কোথাও বা প্রচণ্ড গরম, মহাকাশের কোনো অঞ্চলে চলেছে নিত্য বিস্ফোরণের তাণ্ডবলীলা,—মানুষকে বাস করতে হলে তার এক বিরাট পরিবর্তন দরকার। সৌরজগতই এই বিশাল বিশ্বের সম্পূর্ণ সত্তা নয়,—এর বুকের মধ্যে বিরাজ করছে কোটি কোটি তারকা, অজস্র গ্রহানুপুঞ্জ ও নীহারিকা। কোথায় যাবে মানুষ!—কতোদূরে যেতে পারবে সে?

মহাশূন্য জয়ের পর মানুষ কি লাভ করবে তার হিসাবনিকাশ করা সহজ নয়। হয়তো কোনদিন শুক্র অথবা মঙ্গলের বুকে গড়ে উঠবে

বিরাট শহর ও নতুন এক সভ্যতা যার কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। খৃষ্টপূর্ব কোনো শতাব্দীতে মগধ-সাম্রাজ্যের কোন বাসিন্দার পক্ষে আজকের মহানগরী কলকাতা অথবা বোম্বায়ের কথা কল্পনা করাও ছিল অসম্ভব। কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করতে এসে স্বপ্নেও ভাবেন নি যে একদিন এর বুকের মধ্যে পেট্রোলিয়াম পাওয়া যাবে, যার দাম আধুনিক সভ্যতার যুগে সোনার খনির চাইতেও বেশি। কানাডার বিরাট প্রান্তরে বসতি স্থাপন করার আগে ঔপনিবেশিকেরা স্বপ্নেও ভাবে নি যে একদিন এই দেশেই পাওয়া যাবে তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থের অপর্যাপ্ত খনি যা আগামী যুগে শক্তির প্রধান ভাণ্ডার হবে। দেখা গেছে প্রায় সব ক্ষেত্রেই নতুন দেশ আবিষ্কারের প্রচেষ্টা লাভজনক হয়েছে। মহাকাশের সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে নতুন জগত আবিষ্কার করে মানুষ আবার কি নতুন মহালাভের সম্মুখীন হবে? পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তির সঙ্গে হৃদ্‌পিণ্ডের সর্বদাই যে যুদ্ধ চলেছে, জানি না তার জন্য মানুষের জীবন-শক্তি কতোখানি ক্ষয় হয়, চাঁদের আকর্ষণী শক্তি কম তাই সেখানে হয়তো জীবনী শক্তি কম না হয়ে বৃদ্ধিলাভ করতে পারে। যাঁরা হৃদ্‌পিণ্ডের রোগে পৃথিবীতে কষ্ট পাচ্ছেন, কে বলতে পারে তাঁরা চাঁদের দেশে নিরোগ দেহে পরম আরামে দিন যাপন করবেন কিনা? সঠিক অনুমান অসম্ভব তাই আশা আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতি দিয়ে এর কাল্পনিক একটি ছবি মনে মনে আমাদের এঁকে নিতেই হবে। কিন্তু এতো কেবল আশা ও আলোর কথা গেল, এর পিছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে অন্ধকার। সংবাদপত্রে দেখেছিলাম কোনো দেশের সরকার শূন্যচারী গ্রহে অথবা উপগ্রহে সামরিক উপনিবেশ স্থাপনের গুরুত্বের কথা বিশেষ বিবেচনার সঙ্গে চিন্তা করছিলেন। শূন্যদেশে সামরিক উপনিবেশ স্থাপন করা সম্ভব হলে অতি সহজেই যে কোনো দেশের উপর আক্রমণ করা যাবে। শূন্যজয়ের আকাঙ্ক্ষার পেছনে মানুষের এই অভিপ্রেতই যদি লুকিয়ে থাকে তাহলে বিজ্ঞান-সভ্যতার চরম বিকাশ সভ্যতার ইতিহাসের বুকে টেনে দেবে পূর্ণচ্ছেদ। আশঙ্কার সঙ্গেই লুকিয়ে আছে আশা,—কে জানে চাঁদের বিশাল মরুভূমির মধ্যে আমাদের জন্য কোনো অমূল্য রত্ন লুকিয়ে আছে কিনা?

সীমাহীন মহাকাশের বুকে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র নতুন জগত, এক এক করে তাদের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হবে সভ্যতার জয়যাত্রা। বিশ্ব আজ সঙ্কুচিত হয়ে গেছে তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নিকটতর করবার জন্য মানুষ চেষ্টা করছে। মাত্র কয়েক শো বছর আগেকার কথাই চিন্তা করুন না কেন—মানুষের জন্মভূমি এই ছোট্ট পৃথিবীই তার নিজের কাছে অপরিচিত ছিল। পৃথিবীর বুকেই বিরাজ করছিল রহস্যময় বিভিন্ন স্বতন্ত্র জগত, বিজ্ঞানের জয়যাত্রাই এদের একত্রীভূত করেছে। মহাবীর চেঙ্গিস খাঁকে বিশ্বজয় করার উদ্দেশ্যে যে বিরাট অঞ্চল বহু বৎসর ধরে অতিক্রম করতে হয়েছিল, আজকের দিনে যে কোনো মানুষই অক্লেশে তা খুব অল্প সময়ের মধ্যে পরিভ্রমণ করতে পারে। কল্পনা করে দেখুন —সেই প্রাচীন যুগে কলম্বাসকে ভারতবর্ষ আবিষ্কারের সাধনায় আমেরিকার মাটিতে পা দেবার জন্য দশ সপ্তাহ ধরে অসহায় হয়ে সমুদ্রবক্ষে ভাসতে হয়েছিল। কিন্তু আজ প্রথম অভিযাত্রীর দল চন্দ্র-বিজয়ে যাত্রা করে মাত্র পাঁচ দিনের মধ্যেই ঐ নতুন সাম্রাজ্যে পা দিতে হয়তো সমর্থ হবেন।

ভয় নিশ্চয়ই আছে। স্তব্ধ এই বিশাল মহাশূন্য মধ্যযুগের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের বুকে যে শিহরণ জাগাত তাকেই জয় করে আমরা যাত্রা করব নতুন দেশে। আমাদের চোখে থাকবে কলম্বাসের স্বপ্ন, সহায় হবে আগামী যুগের আণবিক যন্ত্রবিজ্ঞান, গ্রহে উপগ্রহে উড়বে মানুষের জয়যাত্রার নিশান।

২

মহাশূন্যের বুকে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন, মানুষের মহাকাশ বিজয়ের চেষ্টার প্রথম সাফল্য। একটি বিশেষ কক্ষপথে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে এই উপগ্রহ বিভিন্ন প্রকার পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মানুষের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে করবে সম্প্রসারিত। প্রথমে মানুষ মহাশূন্যের সঙ্গে পরিচিত হবে, তারপর তার শূন্যযান যাত্রা করবে চন্দ্রে, মঙ্গলে ও অন্যান্য গ্রহে উপগ্রহে। মহাশূন্যযানগুলিকে জ্বালানী সরবরাহও এই কৃত্রিম উপগ্রহগুলির অন্যতম প্রধান কাজ। স্টেপ রকেটের সাহায্যে এদের সজোরে ছুঁড়ে

দেওয়া হবে মহাকাশের বুকে ; কক্ষপথে পৌঁছে দিয়ে রকেটগুলির দায়িত্ব হবে সারা, তারা খসে পড়বে আর নতুন কৃত্রিম উপগ্রহ আপন পথে সুরু করবে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে। মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই,—সে মনে করে একদিন এইভাবেই স্থাপিত মহাকাশের এক কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাত্রা করার ব্যবস্থা করা অনেক সহজে সম্ভব হবে। পৃথিবী থেকে মহাশূন্যের যেকোনো অঞ্চলের তুলনায় আবহাওয়ামণ্ডলের পরিধি খুব কম হওয়া সত্ত্বেও, মহাকাশযাত্রীর এই সামান্য অংশটুকু পরিভ্রমন করতেই সবচেয়ে বেশী সামর্থ্য ব্যয় হবার কথা, তাই অনেকের ধারণা উপগ্রহ থেকে যাত্রা সুরু করলে মানুষ অনেক সহজে হয়তো গ্রহান্তরে উপস্থিত হতে পারবে। বিরাট কৃত্রিম উপগ্রহ কবে নির্ম্মাণ করে কার্য্যকারী করা সম্ভব হবে জানিনা, তবে কক্ষপথে আবর্ত্তনশীল ক্ষুদ্র কৃত্রিম উপগ্রহ যে অতি শীঘ্রই মহাকাশে স্থাপন করা হবে এ বিষয়ে আজকের বিজ্ঞানীমহল স্থিরনিশ্চিত।

বিজ্ঞানী রস কৃত্রিম উপগ্রহের একটি চমৎকার নক্সা প্রস্তুত করেছেন। উপগ্রহটিতে কর্ম্মচারী থাকবে ২৪ জন, এবং এদের এক বছরের খাবার, বাতাস, জল ইত্যাদি অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ নিয়ে মোট ওজন হবে ৭০ টন। উপগ্রহটির মধ্যস্থলে প্রায় ২০০ ফিট ব্যাসার্দ্ধের একটি গোলাকার আয়না থাকবে। আয়নাটি সূর্য্যালোক থেকে উত্তাপ সংগ্রহ করবে, এবং সেই উত্তাপ পরিবর্ত্তিত করা হবে বিদ্যুৎশক্তিতে। সেখানে মাধ্যাকর্ষণ বিহীন এক অভিনব পরিস্থিতির উদ্ভব হবে যার সঙ্গে পৃথিবীর মানুষের পরিচয় নেই, তাই উপগ্রহটিকে তার নিজের মেরুদণ্ডের উপর ঘূরপাক খাইয়ে কৃত্রিম মাধ্যাকর্ষণযুক্ত এক পরিবেশও রচনা করা হবে। এই উপগ্রহের প্রধান কাজ পর্যবেক্ষণ করা,—মহাকাশ ও পৃথিবী এই উভয় দিকই তার দৃষ্টির সামনে থাকবে। উপগ্রহটি থেকে সর্ব্বদাই কম করেও অর্দ্ধেক পৃথিবী যাবে দেখা, আর বিশাল মহাকাশতো মাথার উপরেই বিস্তৃত হয়ে আছে। পৃথিবী থেকে মহাশূন্য পর্য্যবেক্ষণের অসুবিধা অনেক, আবহাওয়ামণ্ডলের আবরণ নানা প্রকার ভুলভ্রান্তি সৃষ্টি করে, তাই কৃত্রিম উপগ্রহের উপর প্রতিষ্ঠিত পর্য্যবেক্ষণমন্দির বহু প্রকার অজানা রহস্যের দেবে সন্ধান। ঐ

পর্য্যবেক্ষণমন্দিরের কাছে মহাজাগতিক রশ্মির রহস্যভাণ্ডার হবে উজার, সূর্য্যালোক ও অন্যান্য রশ্মিসমূহের যেসব অংশ আবহাওয়ামণ্ডলের ঘন আবরণ ঠেলে পৃথিবীর বুকে পৌঁছোতে পারে না, মানুষ তাদের পরিচয় পাবে।

সংবাদ সরবরাহের প্রয়োজনে টেলিভিসনের গুরুত্ব খুবই বেশী কিন্তু ভূপৃষ্ঠের বক্রতার জন্য এর প্রচারের সীমানা খুবই ছোট। টেলিভিসনের মাধ্যমে সংবাদ ব্যাপকভাবে প্রচার করতে চাইলে মাত্র ৫০ মাইল অন্তর অন্তর এর পুনরাবৃত্তিকারক সাজসরঞ্জাম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। এর খরচও বেশী, তাছাড়া এর সাহায্যে খুব দূরে সংবাদ বহন করে নিয়ে যাওয়া সহজ কাজ নয়। টেলিভিসনের সংবাদ সমুদ্র পার করে অন্য দেশে নিয়ে যাওয়া তো দুর্লঙ্ঘ্য মনে হয়। কিন্তু কৃত্রিম উপগ্রহের বুকে একটিমাত্র প্রেরণযন্ত্র স্থাপন করলে প্রায় অর্দ্ধেক পৃথিবীতে টেলিভিসনে সংবাদ প্রেরণ করা যাবে। অনেক বিজ্ঞানীর মতে বিষুবরেখার উপর কোন কক্ষপথে ১২০ ডিগ্রী অন্তর তিনটি কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করে একটিতে প্রেরক যন্ত্র এবং অন্য দুইটিতে পুনরাবৃত্তিকারক যন্ত্র বসিয়ে সারা দুনিয়ায় টেলিভিসনে সংবাদ প্রেরণ করা অনায়াসেই সম্ভব। এর ফলে আর্থিক দিক দিয়ে মানবসভ্যতা কতোখানি লাভবান হবে তা কল্পনা করে দেখুন, দুনিয়ার বুকে একযোগে সংবাদ প্রেরণ করা সম্ভব হলে লক্ষ লক্ষ রেডিও এবং টেলিগ্রাফ বার্তা প্রেরণের কেন্দ্র যাবে উঠে; কোটি কোটি গজ তার এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতির ঘটবে সাশ্রয়। অবশ্য কাজটা যে খুব সহজ হবে তা নয়; প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে উচ্চাকাশের আয়নমণ্ডলের রীতি ও প্রকৃতি বিষয়ে গবেষণা চালিয়েই এই কল্পনার সম্ভাব্য সাফল্যের হদিশ মানুষ পাবে। সঠিক ভাবে টেলিভিসনের সংবাদ প্রেরণের জন্য উপগ্রহটির পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে একবার আবর্ত্তনের সময়,—নিজ কক্ষে পৃথিবীর একবার ঘুর্ণনের সময়ের সঙ্গে ঠিক এক হওয়া প্রয়োজন।

আর দেরী নেই যেকোনো সময়ে আমেরিকার বিজ্ঞানীরা মহাশূন্যে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করবেন। ফ্লোরিডার একটি অঞ্চলে টেপা হবে বোতাম আর তার সঙ্গে বিজ্ঞানীদের পরিকল্পনার পথ অনুসরণ

করে মহাকাশের বুকে স্থাপিত হবে মানুষে গড়া প্রথম উপগ্রহ। সোভিয়েত দেশেও বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী পিটার ক্যাপিটজার নেতৃত্বে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনের চেষ্টা করা হচ্ছে কিন্তু তাঁদের কার্য্য-কলাপের সঠিক কিছু সংবাদ এখনও প্রকাশিত হয় নি। মার্কিনী চন্দ্রের ব্যাস হবে ২ ফুটের কাছাকাছি, ওজনও খুব বেশী নয়। পৃথিবীর বুকে একে অক্লেশে আপনি কাঁধে করে নিয়ে বেড়াতে পারেন কিন্তু মহাকাশের কক্ষপথে স্থাপন করবার জন্য প্রয়োজন হবে অসাধারণ ক্ষমতাশালী রকেটের।

বিরাট এই স্টেপ রকেট—নাম ভ্যানগার্ড, নাকের ডগায় ছোট্ট উপগ্রহটিকে বেঁধে নিয়ে প্রচণ্ড তিনটি ছুটে সে পরিকল্পিত কক্ষপথে পৌঁছে যাবে। তিন স্টেপ এই রকেটের,—প্রথম রকেটটিই সবচেয়ে শক্তিশালী। এর জ্বালানী হলো অ্যালকোহল আর পেট্রোলের একটি সংমিশ্রণ, উচ্চাকাশে নির্ব্বিবাদে দহনক্রিয়া চালাবার জন্য সঙ্গেই একটি অক্সিজেনের আধার বহন করে নিয়ে যাওয়া হবে। ঘণ্টায় ৩-৪ হাজার মাইল গতিবেগে যাত্রা করে প্রায় ৩০-৪০ মাইল উঁচুতে প্রথম রকেটটির কাজ হবে শেষ। মূল স্টেপ রকেটের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে তখন ঝাঁপ দেবে মহাসমুদ্রে, সুরু হবে দ্বিতীয় রকেটির কার্য্যকলাপ। ইতিমধ্যেই উপগ্রহটির পথ চক্রবালের দিকে হেলে পড়েছে। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের রকেটটি যাত্রা করবে ঘণ্টায় ১১ হাজার মাইল গতিবেগে, এর জ্বালানী হবে হাইড্রাজিন ও নাইট্রিক অ্যাসিডের একটি সংমিশ্রণ, এবং পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩০০ মাইল উঁচুতে তৃতীয় পর্য্যায়ের রকেটের হাতে উপগ্রহটির দায়িত্বভার দিয়ে সে খসে পড়বে। কোন কঠিন বিস্ফোরকের দহন ক্রিয়ার সাহায্যে স্টেপ রকেটটির তৃতীয় পর্য্যায়ের যাত্রা হবে সুরু, গতিবেগ ঘণ্টায় ১৮ হাজার মাইল। পরিকল্পিত কক্ষপথে কৃত্রিম উপগ্রহটিকে পৌঁছে দিয়ে নিজে সে হারিয়ে যাবে মহাশূন্যে। এই বিরাট পরিকল্পনাটিকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য আমেরিকার নৌবিভাগীয় গবেষণামন্দিরের বিজ্ঞানীবৃন্দ আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। এই প্রচেষ্টার অন্যতম পরিচালক বিজ্ঞানী মিল্টন রোজেন কিন্তু সাফল্যের বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চিত নন। শেষ পর্য্যায়ের গতিবেগের উপরেই সবকিছু নির্ভর

করছে। গতিবেগ জোরে হলে উপগ্রহটি মহাকাশে হারিয়ে যাবে,—আস্তে হলে পৃথিবীর আকর্ষণে ছুটে আসতে গিয়ে আবহাওয়া মণ্ডলের ঘর্ষণে পুড়ে হয়ে যাবে ছাই। আমেরিকার ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সস্ তাই ১২টি ভ্যানগার্ড রকেট নির্ম্মাণ করতে চান—১২ বারের চেষ্টায় আশা করা যায় মানুষ মহাকাশে একাধিক উপগ্রহ স্থাপন করতে সমর্থ হবে।

মহাকাশের এই কৃত্রিম উপগ্রহকে সারা দুনিয়া থেকে পর্য্যবেক্ষণ করার ব্যবস্থা হচ্ছে। বিশেষভাবে নির্ম্মিত যন্ত্রসমূহ ঐ উপগ্রহের উচ্চতা, অবস্থিতি, গতি ও কক্ষপথ নির্দ্ধারণে তৎপর হবে। উপগ্রহটির মধ্যে অবস্থিত স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রসমূহ প্রেরণ করবে বেতার তরঙ্গ যার সাহায্যে মহাকাশের বহু অজানা তথ্যের আমরা সন্ধান পাব। উপগ্রহটি হারিয়ে যাবারও ভয় আছে তাই সমগ্র বিশ্বের বহু প্রতিষ্ঠান ও সখের আকাশ পর্য্যবেক্ষণকারীরা এর দিকে বিশেষ নজর রাখবেন।

ভারতবর্ষের অমৃতসহর, দেরাদুন, দিল্লী, পুনা ও কোদাইকানাল থেকে পর্য্যবেক্ষণ চালান হবে। সূর্য্যাস্তের ঠিক পরেই, সূর্য্যের প্রতিফলিত আলোতে অতি সাধারণ দূরবীনের সাহায্যেই এই কৃত্রিম উপগ্রহ যাবে দেখা,—বিজ্ঞানীরা মনে করেন প্রখর দৃষ্টিসম্পন্ন কোন কোন লোকের পক্ষে খালি চোখেই একে দেখা সম্ভব হতে পারে।

প্রাচীন চন্দ্রের ঈর্ষার কারণ হয়ে মানুষে গড়া এই ক্ষুদ্র চন্দ্র আকাশের মাঝে কতোদিন বিরাজ করবে তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। সব কিছুই নির্ভর করছে কক্ষপথের আবহাওয়ার ঘনত্বের উপর। ঘনত্ব বেশী হলে, আবহাওয়ার ঘর্ষণে গতিবেগ তাড়াতাড়ি কমে যাবে এবং উপগ্রহটি পড়বে খসে। পরিকল্পনা মতো ঠিক ভাবে কাজ হলে বিজ্ঞানীরা আশা করছেন প্রায় এক বছর ধরে কৃত্রিম উপগ্রহটি মহাকাশে অবস্থান করবে। অবস্থানের সময় পর্য্যবেক্ষণ করে ঐ কক্ষপথের আবহাওয়ার ঘনত্ব পরিমাপ করা সম্ভব হবে।

বিরাট উপগ্রহ, যা মহাশূন্যে জ্বালানী সরবরাহ করবে ; যার মধ্যে নির্ম্মিত হবে মহাকাশ পর্য্যবেক্ষণের বিশাল মন্দির—তার পথপ্রদর্শক হলো এই ক্ষুদ্র কৃত্রিম শূন্যচারী দেহ। এর সাহায্যে আমরা পৃথিবীর

মানচিত্রের ত্রুটিগুলি নির্দ্ধারণ করতে পারবো, পৃথিবীর প্রকৃত আকারের পাব সঠিক পরিচয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের ঘনত্ব বিভিন্ন প্রকার, বিজ্ঞানীরা আশা করেন মহাকাশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থানের সময় উপগ্রহটির উপর পৃথিবীর আকর্ষণ পরিমাপ করে ভূপৃষ্ঠের নানা অঞ্চলের ঘনত্ব হিসাব করা যাবে।

৩

যে জাহাজটিতে চড়ে আমরা মহাশূন্যে যাত্রা করবো তার স্বভাব-চরিত্র কিরকম হবে তা জানবার কৌতূহল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। নতুন যুগের পুষ্পকরথ হলো রকেট,—অর্দ্ধশতাব্দী পরে এই রকেটে চড়েই মানুষ গ্রহে-উপগ্রহে বিজয়াভিযান চালাবে।

এখন প্রশ্ন, এই গতিশক্তি রকেটের মধ্যে কি উপায়ে সঞ্চারিত হয়? রকেটের লেজের দিকে একটি কক্ষে বিস্ফোরণ ঘটান হয়,—বিস্ফোরণজাত পদার্থগুলি ঐ কক্ষের প্রতি অংশে প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি করে। এখন একটি সরু পথ দিয়ে ঐ চাপযুক্ত পদার্থগুলিকে যদি বার হয়ে যাবার সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে যে দিকে বহির্গমনের পথ আছে সে দিকের চাপ অত্যন্ত কমে যাবে কিন্তু অপর দিকের চাপের হঠাৎ পরিবর্তন হবে না, ফলে উচ্চচাপের ঠেলায় রকেটটি সেইদিকেই নড়তে আরম্ভ করবে। এই ঠেলাই রকেটের গতিশক্তির মূল উৎস। একটি উদাহরণের কথাই বিবেচনা করুন না কেন?—বন্দুক ছুড়লেন, বন্দুকের ভেতরে বিস্ফোরণের ফলে প্রচণ্ড উচ্চচাপের সৃষ্টি হলো এবং এই চাপ বন্দুকের নলের দিকেই খুঁজে পেল নিঃসরণের পথ। নলের দিকের চাপ গেল কমে কিন্তু ভেতরের চাপ ঠিকই আছে, তাই বন্দুক-চালক পেছন দিকে একটি ধাক্কা খেলেন। রকেটের বিস্ফোরণ কক্ষে উৎপাদিত উচ্চচাপযুক্ত পদার্থগুলিকে পৃথিবীর দিকে একটি সরু নল দিয়ে বার হবার পথ করে দিলেই আমরা জন্মভূমির মায়া কাটিয়ে পিছন দিকের ধাক্কায় সোজা শূন্যে উঠে যাব।

রকেটটি যাত্রা করবে মহাকাশের পথে, গতিবেগ বজায় রাখবার জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর শূন্য পথেই ঘটান হবে বিস্ফোরণ।

বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা সুযোগ ও সুবিধা বিচার করে মহাশূন্যযানের নানারকম নক্সা ও পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছেন, কিন্তু ঠিক কি ধরণের শূন্যযান সর্বপ্রথম অন্যগ্রহে অথবা উপগ্রহে অবতরণ করবে তা বলা সম্ভব নয়। অভিযান চালান হবে আরো কয়েক বছর পরে,—বিজ্ঞান গবেষণা যেভাবে প্রতিদিন এগিয়ে যাচ্ছে তাতে সেই সময় মানুষ তার কোন নবলব্ধ জ্ঞানকে কিভাবে কাজে লাগিয়ে আরো উন্নতশ্রেণীর শূন্যযান নির্মাণ করবে তা বলা কঠিন। অথানে মোটামুটি শূন্যযানের মূলনীতি ও সমস্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

প্রথমেই দরকার একটা প্রচণ্ড গতিবেগের যার সাহায্যে আমরা অক্লেশে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অগ্রাহ্য করে মহাশূন্যে পাড়ি জমাতে পারবো। হিসেব করে দেখা গিয়েছে, এই গতিবেগ ঘণ্টায় ২৫০০০ মাইল হওয়া প্রয়োজন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আবহাওয়া মণ্ডলের বাধা এবং গতিশক্তির কথা চিন্তা করলে দেখা যায়, প্রয়োজন হবে প্রায় প্রতি ঘণ্টায় ২৯০০০ মাইল গতিবেগের। ঘণ্টায় ২৫০০০ অথবা ২৯০০০ মাইল গতিবেগের কল্পনা করা আজকের দিনে অবাস্তব। বিজ্ঞান গবেষণার যে পর্যায়ে এতোদিনের চেষ্টায় আমরা এসে উপনীত হয়েছি তা এই প্রচণ্ড গতিবেগ সৃষ্টি করতে অসমর্থ। গতিবেগের সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন জ্বালানীর—কিন্তু আজ পর্যন্ত এমন কোন রাসায়নিক জ্বালানির সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়নি যে এই অপার্থিব শক্তি সৃষ্টি করতে পারে। আণবিক শক্তির সাহায্যে আশা করা যায়, কিছুদিন পরে আমরা হয়তো এই গতিশক্তি সৃষ্টি করতে পারবো, কিন্তু তা বলে বিজ্ঞানীরা হাত গুটিয়ে বসে নেই। তাঁরা স্টেপ রকেটের সহায়তায় গতিসঞ্চার করে, রাসায়নিক জালানীর দ্বারা মহাশূন্য বিজয়ের চিন্তা করছেন। অক্সিজেন-হাইড্রোজেন, অক্সিজেন-ডাইবোরেন, ফ্লোরিন-হাইড্রোজেন, ফ্লোরিন-হাইড্রাজিন, মিথানল-হাইড্রাজিন-জল প্রভৃতি মিশ্রণগুলি রাসায়নিক জ্বালানী হিসাবে যথেষ্ট মূল্যবান হলেও এদের দিয়ে একেবারে ঐরূপ প্রচণ্ড গতিশক্তি সৃষ্টির চেষ্টা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই সব জ্বালানীই স্টেপ রকেটে শক্তি সরবরাহ করবে।—প্রথম

বিস্ফোরণের পর আমাদের রকেটটা মহাকাশে যাত্রা করলো। এই রকেটটির মধ্যে রয়েছে আর একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছোট রকেট, সেটি নিজেই বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বাইরের বিরাট শূন্যযানটিকে পরিত্যাগ করে মহাশূন্যে ভ্রমণ করতে পারে। স্টেপ রকেটের মজাটা এই যে, পৃথিবী থেকে প্রেরিত বড় এবং সম্পূর্ণ রকেটের দম যখন ফুরিয়ে আসবে তখন সে অনর্থক এই বিশাল দেহটিকে টানবার চেষ্টা না করে পরিত্যাগ করবে। সেই স্থানটিতেই শুরু হবে ভেতরের ছোট রকেটটির কার্যকলাপ, অকেজো ভারী বড় রকেটটিকে ফেলে দিয়ে সে তার হাল্কা দেহ নিয়ে অনেক বেশী জোরে মহাশূন্যে বিচরণ করতে পারবে। সুবিধাটা ভেবে দেখুন,—বড় রকেটটির গতিশক্তি আগেই তার মধ্যে অবস্থিত ছোট রকেটটি পেয়েছে, এবার নিজের দেহের বিস্ফোরণের ঠেলায় তার ছুট হঠাৎ প্রচণ্ডভাবে যাবে বেড়ে। তাছাড়া এখানে বাতাস নেই তাই ছোট শূন্যযানের কলকব্জা কাজ করবে নিখুঁতভাবে।

এটা হোল স্টেপ রকেটের মূলনীতি,—একেই হিসেব মতো বাড়িয়ে আমরা গ্রহে-উপগ্রহে যাবার ব্যবস্থা করবো। মাত্র দুটো রকেট একসঙ্গে থাকবে বলেছি, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুসারে যথেচ্ছসংখ্যক রকেটকে একত্র করে শূন্যযান নির্মাণ করা যাবে। বড়টির দম ফুরিয়ে গেলে একটির পর একটিকে পরিত্যাগ করে, হাল্কা দেহ নিয়ে অন্তবর্তী শূন্যযান মহাশূন্য বিজয়ে করবে যাত্রা। ওজন কমার সঙ্গে সঙ্গেই গতিশক্তি যাবে অসম্ভব রকম বেড়ে। ধরুন ৫০টি রকেট পর পর সাজান ছিল, একবারের বিস্ফোরণে এই সমস্ত দেহটি যে গতিবেগে মহাকাশ পরিভ্রমণ করতো, স্টেপ রকেট হওয়ার জন্য সর্বশেষের হাল্কা অংশটি তার ৫০ গুণ জোরে ছুটতে সক্ষম হবে। কিন্তু স্টেপ রকেটের ক্ষমতার সীমাও নির্দিষ্ট,—কারণ বর্তমানে ব্যবহৃত জ্বালানী, চন্দ্রে অভিযানের উপযুক্ত গতিসৃষ্টির জন্য যে পরিমাণে প্রয়োজন হবে তা পাঠকেরা কল্পনার মধ্যেও আনতে পারবেন না। একটি রকেটের ওজন অনুসারে জ্বালানীর পরিমাণ শতকরা ৭৫ ভাগ,— শূন্যযানের কাঠামো হোল শতকরা ২০ ভাগ! তাহলে হিসেব করে দেখুন, অভিযাত্রী দল এবং তাদের সাজসরঞ্জাম নেবার জন্য শতকরা

মাত্র ৫ ভাগ অবশিষ্ট থাকে! অর্থাৎ প্রথম অভিযাত্রী দলের বাতাস, খাবার ও অন্যান্য জিনিসপত্তরের ওজন খুব কম করেও ১০ টনের কাছাকাছি হলেও, সর্ব্বসমেত শূন্যযানটির ওজন হবে ২০০ টন।

আমাদের এই হিসাব অনুসারে শূন্যযান কর্ত্তৃক বাহিত মালপত্র শূন্যযানের ওজনের মাত্র শতকরা ৫ ভাগ, তাহলে 'স্টেপ রকেটের' অবস্থাটা হবে কি? দ্বিতীয় রকেটটি প্রথম রকেটটির কাছে একটি সামাল ছাড়া আর কিছুই নয়,—তৃতীয় রকেটের অবস্থাও দ্বিতীয় রকেটের কাছে ঠিক তাই। অর্থাৎ দ্বিতীয় রকেটের ওজন প্রথম রকেটের আর তৃতীয় রকেটটির ওজন দ্বিতীয় রকেটের শতকরা মাত্র ৫ ভাগ হবে, পর পর ঠিক এমনইভাবেই 'স্টেপ রকেটে' ভেতরকার রকেটের ওজনসমূহ থাকবে কমতে। হিসাব করে দেখা গিয়েছে, ৩টি রকেট সমন্বিত 'স্টেপ রকেটের' সর্বশুদ্ধ ওজন যদি ৪০০ টন হয় তাহলে মাত্র ১১২ পাউণ্ড ওজন মহাশূন্যে বহন করা যাবে। খাবারদাবার, বাতাস আর যন্ত্রপাতি নেবার কথা দূরে থাক মাত্র একজন মানুষকেও এই 'স্টেপ রকেট' বহন করতে পারবে না! এইবার বলুন তো ১০ টন বস্তু বহন করবার মতো স্টেপ রকেটটির সর্বসমেত ওজন কতো হওয়া উচিত? চন্দ্রে যদি উপনিবেশ স্থাপন করতে হয়, তাহলে যে মালমসলা পৃথিবী থেকে আমাদের পাঠাতে হবে তা পরিবহনের জন্য অফুরন্ত পরিমাণ জালানী সংগ্রহ করে একটি বিরাট 'স্টেপ রকেট' নির্মাণ করা পৃথিবীর যে কোন ধনী রাষ্ট্রের পক্ষেও সহজসাধ্য নয়।

বিজ্ঞানীরা আর একভাবে চিন্তা করছেন। মহাশূন্যে যদি কোন জালানীর ভাণ্ডার স্থাপন করা যায়, যা কোন একটি বিশেষ কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবে তা হলে আর চিন্তার কারণ থাকে না। 'ষ্টেপ রকেটের' পরিবর্তে হাল্কা একটি মাত্র রকেটেই যাত্রা সুরু করা হবে এবং রকেটটি পথিমধ্যে মহাশূন্যের ঐ জালানীর ভাণ্ডার থেকে জালানী সংগ্রহ করে গতিশক্তি রাখবে অক্ষুণ্ণ। ব্যাপারটা তাহলে শুনুন,—পৃথিবী থেকে প্রথম ছুটে রকেটটি ঐ কক্ষপথে উপস্থিত হয়ে জালানীর ভাণ্ডারের সঙ্গে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে করতে জালানী করবে সংগ্রহ এবং তারপরই সেখান থেকে লাগাবে দ্বিতীয় ছুট। প্রয়োজন হলে

একাধিক জালানীর ভাণ্ডারও মহাশূন্যের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করা যাবে, তাহলে অবতরণের সময় এবং ফেরার পথে জালানী সংগ্রহের দুশ্চিন্তাও হবে দূর।

আমরা মোটামুটি যে উপায়গুলির কথা আলোচনা করলাম, কোন একদিন হয়তো তার সাহায্যে চন্দ্রে অবতরণ করা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু 'স্টেপ রকেটের' সহায়তায় গ্রহান্তরে যাত্রা করার চেষ্টা অসম্ভব বলে মনে হয়, কারণ এই বিরাট মহাশূন্য অতিক্রম করার জন্য যে পরিমাণ জালানী লাগবে তা সঙ্গে দিয়ে দেওয়া এক অবাস্তব ব্যাপার! হিসাব করে দেখা গিয়েছে, জিনিসপত্র সমেত অভিযাত্রী দলের ওজন যদি ১০ টন হয় তাহলে মঙ্গলগ্রহে যাবার জন্যে শূন্যযান এবং জালানার ওজন কম কোরেও প্রায় ৭৩০০০ টন হবে! অর্থাৎ মহাশূন্যের কক্ষপথে জালানী সংগ্রহের কোন সুব্যবস্থা না থাকলে রাসায়নিক জালানীর সহায়তায় গ্রহান্তরে যাত্রার কল্পনা করাও বর্তমানকালে সম্ভব নয়। কেবলমাত্র পৃথিবীর কক্ষপথেই জালানী সংগ্রহ নয়, ফিরবার সময় মঙ্গল অথবা অন্যান্য গ্রহসমূহের কক্ষপথেও পরিভ্রমনকারী জালানী ভাণ্ডারের সহায়তা আমাদের নিতে হবে! ইংল্যাণ্ড থেকে যখন একটি উড়োজাহাজ আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে আমেরিকা যাত্রা করে, তখন সে নিশ্চয়ই ফিরবার জালানী সঙ্গে নিয়ে যায় না,—যদি নিয়ে যেতে হতো তাহলে ভ্রমণ করা এই পৃথিবীতে কষ্টসাধ্য হয়ে উঠতো। মহাশূন্য অতিক্রম করার জন্যও মানুষকে এই ব্যবস্থার সাহায্য নিতে হবে। পৃথিবী থেকে জালানী নিয়ে আমরা গ্রহান্তরে যাত্রা করবো, পথে জালানী সংগ্রহ করবো কক্ষপথের জালানী ভাণ্ডার থেকে; আবার ফিরবার সময় অন্যগ্রহের কক্ষে অবস্থিত জালানী ভাণ্ডার আমাদের এই অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ সরবরাহ করবে। মহাশূন্যের বিভিন্ন অঞ্চলে এইরকম জালানী ভাণ্ডার. স্থাপন করবার কল্পনা মানুষ করে,—চেষ্টাও সে করবে কিন্তু সফল হবে কবে তা বলা কঠিন।

পরমাণুশক্তি আবিষ্কার হওয়ার পর মহাশূন্য বিজয়ে মানুষের চিন্তাধারায় এসেছে এক বিরাট পরিবর্তন। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, এই মহাশক্তির সহায়তায় তাঁরা সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে অতি

অনায়াসেই গ্রহে-উপগ্রহে যাত্রা করতে পারবেন। সাধারণ হিসেবে দেখা গিয়েছে, মাত্র ৫০ পাউণ্ড পরমাণু জ্বালানীর সাহায্যে আমরা অক্লেশেই ১০০০ টনের একটি শূন্যযানকে চন্দ্রপৃষ্ঠে নিয়ে গিয়ে অভিযান চালিয়ে আবার ফেরত নিয়ে আসতে পারবো! আণবিক বিস্ফোরণে পরমাণু জঠরের মাত্র হাজার করা ১ ভাগ শক্তি বিকীরিত হয়, তাহলে কল্পনা করে দেখুন, উন্নতশ্রেণীর যন্ত্র-বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা যেদিন পরমাণু জ্বালানীর অধিকাংশ শক্তিকে মুক্ত করে ব্যবহার করতে পারবো, সেদিন মাত্র ঐ ৫০ পাউণ্ড জ্বালানীর সাহায্যে মঙ্গল অথবা শুক্রগ্রহ বিজয় করে ফিরে আসাও অসম্ভব হবে না। পরমাণু বিস্ফোরণের সাহায্যে রকেটের প্রচণ্ড ছুট এবং তার সঙ্গে আলো ও উত্তাপের জন্য আয়ত্তাধীন শক্তি সরবরাহ করা সম্ভব হলে কেবলমাত্র নিকটবর্তী গ্রহসমূহ কেন—সৌরজগতের বাইরেও আশা করা যায়, মানব সভ্যতা সাম্রাজ্য স্থাপন করতে সক্ষম হবে। পাঠকেরা হয়তো চিন্তা করতে আরম্ভ করেছেন,—যাক্ এতক্ষণে ব্যাপারটা একটু সোজা হলো। হাজারগুণ জ্বালানী বেশী নিয়ে মহাকাশে উঠতে যাওয়াই ভীতিপ্রদ, এবার মাত্র ৫০ পাউণ্ডেই কাজ সারা হয়ে যাবে। কিন্তু জটিলতা একবিন্দুও কমেনি। পরমাণু যন্ত্রবিজ্ঞান আজকের দিনে শৈশবাবস্থায়,—সুতরাং মহাকাশ বিজয়ের জন্য উন্নতির চরম পর্য্যায়ে পৌঁছতে এর লাগবে আরো বহুদিন। মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে, পরমাণু শক্তির অবদানের সম্ভাবনার কথা পঞ্চমুখে বলেও শেষ করা যায় না, তবু একথা অনস্বীকার্য যে, ক্রমবর্ধমান সমাজের আত্মরক্ষার্থে মহাকাশ বিজয়ে পরমাণু শক্তির সহায়তার কাহিনী বিজ্ঞান সভ্যতার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় দাবী করবে।

পরমাণু রকেটের কতকগুলি সমস্যা পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহলের চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাসায়নিক বিস্ফোরণের পর গ্যাসসমূহ একটি সরু নলের ভিতর দিয়ে একই দিকে প্রচণ্ডগতিতে বেরিয়ে যায়, কিন্তু আণবিক জ্বালানী ব্যবহার করলে বিস্ফোরণ-জাত পদার্থসমূহকে একই দিকে চালিয়ে নেওয়া মোটেই সহজসাধ্য হবে না। পরমাণু প্রক্রিয়ার উৎপাদন সমস্তদিকেই যথেচ্ছভাবে বিকীরিত হয় তাই

তাদের একই দিকে চালিত করে শূন্যযানের পশ্চাতের একটি সরু মুখ দিয়ে প্রচণ্ডগতিতে বার করে দিতে হলে ক্ষমতাশালী চুম্বক অথবা বৈদ্যুতিক পরিবেশের দরকার। এই পরিবেশ সৃষ্টিও মুখের কথা নয়,—এর জন্য বিজ্ঞানীমহলের বহুদিনের প্রচেষ্টা ও উদ্যম ব্যয় করতে হবে, অর্থাৎ যন্ত্রবিজ্ঞানের জটিলতা যাবে আরো অনেক বেড়ে। তাছাড়া আর একটি কথাও আছে—পরমাণু প্রক্রিয়ার ফলে অনেক ভারী কণার সৃষ্টি হয় যারা বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন নয়, তাদের ওপর চুম্বক অথবা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের প্রভাব ঘটবে না।

আণবিক জ্বালানীর এই জটিলতা রোধ করার জন্য নতুন এক চিন্তাও বিজ্ঞানীরা করছেন। শক্তির দ্বারা ঘটান হয় বিস্ফোরণ এবং বিস্ফোরণের ফলে কিছু রাসায়নিক দ্রব্য হঠাৎ গ্যাসীয় অবস্থায় চলে গিয়ে ফেঁপে উঠে সৃষ্টি করে উচ্চচাপের এবং এই উচ্চচাপযুক্ত বিস্ফোরণজাত পদার্থ পরে একটি সরু নলের মধ্য দিয়ে প্রচণ্ড বেগে বার হয়ে আসে। রাসায়নিক জ্বালানী দুটি কাজ করে ;—শক্তিকে করে সরবরাহ এবং তার সঙ্গে জোগায় ঐ কার্য্যকারী পদার্থ, যার প্রসার ও বহির্গমনের ফলেই রকেটে গতি সঞ্চার হয়। পরমাণু রকেটে এক মিশ্র ব্যবস্থার আশ্রয় নেওয়া হতে পারে। পরমাণু 'পাইল' শক্তি সরবরাহ করবে কিন্তু স্ফীতি ও উচ্চচাপ সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা হবে অন্য একটি তরল পদার্থ। অর্থাৎ শক্তির সাহায্যে ঐ কার্য্যকারী তরল পদার্থ প্রসারিত—অবশেষে এমন কি পরমাণুতে বিভাজিত হয়ে প্রচণ্ড উচ্চচাপের সৃষ্টি করে একটি সরু নলের মধ্য দিয়ে বার হয়ে আসবার সময় রকেটকে দেবে নাড়া। এই কাজের জন্য হাইড্রোজেন,—হিলিয়াম প্রভৃতি মৌলিক পদার্থের নাম করা হয়। কিন্তু এতেও একটা বিরাট অসুবিধা আছে ; তরল হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম পেতে হলে আমাদের গ্যাসগুলিকে যথাক্রমে বরফ জমার তলায় আরো ২৫৩ ডিগ্রী এবং ২৬৯ ডিগ্রী ঠাণ্ডা করতে হবে। এদের ব্যবহার তাই খুবই কষ্টকর এই প্রসঙ্গে অনেকেই মনে করেন তরল মিথেন অথবা তরল অ্যামোনিয়ার ব্যবহার লাভজনক।

মহাশূন্যযানে স্থানের বড়ই অভাব তাই অনেকেই স্থান কম লাগবে

বলে চালক বস্তুটির জন্য কঠিন পদার্থ ব্যবহারের কথা চিন্তা করছেন। পরমাণু শক্তি চালিত মহাশূন্যযান ঠিক কি রকম হবে তা নির্ভর করছে আগামী যুগের গবেষণার ওপর।

৪

তখনও টেলিস্কোপের আবিষ্কার হয় নি, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আকাশের দিকে চেয়ে থাকতেন রাতের পর রাত, এই অনন্ত মহাশূন্যের শেষ কোথায়, কী আছে চন্দ্রলোকে, অন্যান্য গ্রহে এবং উপগ্রহে ?

চাঁদের দেহে কালো দাগের চিহ্ন দেখা যায়। বিজ্ঞানীদের সম্বল একমাত্র কল্পনা, তাঁরা স্থির করলেন নিশ্চয়ই ওগুলো সমুদ্র, গভীর অতল, তাই দেখাচ্ছে কালো। এই সাগর-উপসাগরের নামকরণ হতে দেরি হল না, কেউবা হল প্রশান্তির সাগর আবার কেউবা রামধনুর উপসাগর।

অপরূপ মায়াঘেরা এই রাজ্য মানুষের স্বপ্নের জগতেই এতদিন বিরাজ করেছে,—এইবার মানুষ নিজে যাবে রামধনুর উপসাগরে।

প্রথমে পৃথিবীর বুক থেকে কয়েক'শ মাইল উঁচুতে নির্মাণ করা হবে কৃত্রিম উপগ্রহ, মহাকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য। তারপর প্রথম অভিযাত্রী দল যাত্রা করবেন চন্দ্রলোকে।

উড়োজাহাজে চন্দ্রলোকে যাওয়া যাবে না, কারণ উড়োজাহাজ ভেসে বেড়ায় বাতাসে ভর দিয়ে। অনন্তশূন্যের যানকে চলতে হবে আপন শক্তিতে ; তাই প্রয়োজন রকেটের। অবস্থা বুঝে করতে হয় ব্যবস্থা, তাই মহাকাশের যাত্রীরা প্রতিবেশী গ্রহে-উপগ্রহে যাবার পথে যেসব পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

শূন্য-ভ্রমণে সর্বপ্রথম বিবেচনা করতে হবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কথা। নিউটনের নিয়ম অনুসারে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটি বস্তু অপরকে আকর্ষণ করে। পৃথিবীও আমাদের সর্বদাই করছে আকর্ষণ। ধরিত্রী মায়ের এই ভালোবাসার টান ছিঁড়ে ফেলে চন্দ্রের দিকে করলেন যাত্রা, —পথে পৃথিবী টানছে, কিন্তু রকেটের গতিশক্তি আকর্ষণী শক্তিকে টাগ অফ ওয়ারে হারিয়ে দিয়ে ক্রমেই সরে যাবে দূরে! এখন এতে অসুবিধা কি হবে? প্রথম অসুবিধা হল আপনি অনুভব করবেন

ওজনবিহীনতা, হয়ে পড়বেন অসহায়। একটু খুলেই বলি, আপনার আমার দেহের যে ওজন আছে তা অনুভব করি প্রতিবন্ধকের মাপ দিয়ে। পৃথিবী আমাদের টানছে নিজের কেন্দ্রের দিকে। কিন্তু ঘরের মেঝে ফুঁড়ে নেবে যেতে পারছি না বলেই সেই প্রতিবন্ধকে অনুভব করছি আমাদের ওজন। আপনি অফিসের লিফটে তেতলায় দাঁড়িয়ে নিজের ওজন বেশ অনুভব করতে পারছেন,—হঠাৎ লিফটের তারগুলো গেল ছিঁড়ে, সোজা নেমে এলেন পৃথিবীর দিকে প্রচণ্ড গতিতে। মাত্র পতনের সময়টুকু আপনি ওজনবিহীনতা অনুভব করতে পারবেন।

শূন্যযানে, রকেটের গতির এক অংশের সঙ্গে পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তির কাটাকুটি হয়ে যাওয়ায় আপনার ওজনের কোনোই অনুভূতি থাকবে না। অবস্থাটা কি সাংঘাতিক তা একবার কল্পনা করে দেখুন। পুজোর একমাস ছুটিতে বেড়াতে যাচ্ছেন চন্দ্রে, আকাশযানে নড়েচড়ে বসতে গিয়ে ঘটল বিষম বিপদ! ওজন নেই, অতএব সোজা ওপরে উঠে গিয়ে কামরার ছাদে খটাস করে আটকে গেলেন– আর নামবার নাম মাত্র নেই! বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মাঝে মাঝে আপনার শূন্যযানে যখন গতি সঞ্চারিত করা হবে তখনকার ঝাঁকানিতে কেবলমাত্র সেই সময়টুকুর জন্যই আপনি ওজন অনুভব করতে পারবেন।

ওজনবিহীনতার প্রশ্নই মহাকাশ পরিভ্রমণের একটি প্রধান সমস্যা। মানুষের দেহ পৃথিবীর বিশেষ পরিবেশে বৃদ্ধিলাভ করেছে, সে কি এই অস্বাভাবিক পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে? যে খাদ্য, বা জল আমরা গ্রহণ করি তা পাকস্থলিতে প্রবেশ করে মাধ্যাকর্ষণের সাহায্যেই,—অবশ্য পেশীর সঙ্কোচনও এর অন্যতম প্রধান সহায়। ওজনবিহীনতার রাজত্বে খাদ্য গ্রহণের কি উপায় হবে? খাদ্য আপনি গ্রহণ করলেন, তা গলাতেই আটকে রইল, পেটে আর কিছুতেই নামে না! অবশ্য এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন না হবার সম্ভাবনাই অধিক। কারণ অনেক অসুস্থ লোক যাঁরা বছরের পর বছর বিছানায় শুয়ে থেকে খাদ্য গ্রহণ করে জীবন ধারণ করছেন তাঁদেরও মাধ্যাকর্ষণ শক্তি খাদ্য পাকস্থলিতে যাবার জন্য খুব বেশি সাহায্য করে না। যাই হোক ওজনবিহীনতার ফলে মানুষ কিরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে এবং

তার সমাধান করবে কিভাবে তা সমস্যা এবং যুক্তির সীমানায় অবস্থান করছে।

ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, তার বাংলা অর্থ হল 'চোখের বাইরে, মনের বাইরে', অর্থাৎ কোনো লোক চোখের বাইরে চলে গেলেই তার ওপর মানুষের টান যায় কমে। প্রকৃতির রাজত্বেও এই প্রবাদ খাটে, যতই দূরে আপনি চলে যাবেন পৃথিবীর আকর্ষণও ততই কমে যাবে। এখন চাঁদের দিকে যেতে যেতে এমন একটা স্থানে এসে উপস্থিত হবেন যেখানে পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তির সঙ্গে চাঁদের আকর্ষণী শক্তি কাটাকুটি হয়ে গিয়ে এক নিরপেক্ষ অঞ্চলের সৃষ্টি করেছে। এখানে অবতরণ করলে কেউই আপনাকে আকর্ষণ করবে না—অসহায়ভাবে ভাসতে থাকবেন মহাশূন্যে। এই নিরপেক্ষ অঞ্চল নিয়ে অনেক লেখকই অনেক কাল্পনিক গল্পই রচনা করেছেন—বর্ণনা দিয়েছেন এই অঞ্চলের বহুবিধ অসুবিধার। কিন্তু রকেটের মধ্যে আপনি ওজন-বিহীন হয়ে থাকায় কখন যে নিরপেক্ষ অঞ্চল পার হবেন তা অনুভবই করতে পারবেন না।

এইবার আসল সমস্যায় আসা যাক—মোদ্দা কথা খাব কি? মনুষ্যজন্ম যখন পরিগ্রহ করেছি তখন যেখানেই থাকি না কেন আমাদের খাদ্য চাই, জল চাই, চাই অক্সিজেন; অতএব এসব নিশ্চয়ই সঙ্গে নিতে হবে। অক্সিজেন সঙ্গে যাবে তরল অবস্থায় অথবা হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড রূপে। হাইড্রোজেন পারঅকসাইড—অক্সিজেন, তাপ এবং জল এই তিনটিই আমাদের সরবরাহ করতে পারবে একসঙ্গে। মনে হয়, কম এবং শূন্য মাধ্যাকর্ষণ শক্তির পরিবেশে মানুষের প্রয়োজনীয় ক্যালরির পরিমাণ অনেক কমে যাবে, সুতরাং পৃথিবীর মতো ভীমসেনী আহার নিশ্চয়ই তার লাগবে না। প্রতিটি নাবিকের অথবা যাত্রীর একবছর মহাশূন্যে অবস্থানের জন্য যে পরিমাণ খাদ্য, জল এবং অক্সিজেন লাগবে তার সমবেত ওজন হবে কমবেশি প্রায় এক টন। আবার অনেকেই মনে করেন এই ওজন হবে আরও কম, কারণ মহাকাশে দূষিত জলকে ঊর্ধ্বপাতন এবং অন্যান্য বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ করে আবার গ্রহণ করা যাবে।

খাদ্যের সংস্কারকে পরিবর্তন করে কেবলমাত্র খাদ্যের সারাংশের ছোট ছোট বড়ির দ্বারা যদি শরীর বাঁচানো যায় তাহলে মহাশূন্যে ভ্রমণের সুবিধা যাবে অনেক বেড়ে। এই ধরনের খাবার প্রচলনের আশা অনেকেই করছেন, কিন্তু ভবিষ্যতে এর সাফল্য কিভাবে আসবে তা বলা খুবই কঠিন, শরীরের সাধারণ নিয়মাবলী অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য খাদ্যের পরিমাণের কিছু প্রয়োজন আছে।

নিউমোনিয়াতে কে প্রাণ হারাতে চায় বলুন ; তাই দার্জিলিঙে যাবার আগে আপনি বেশি করে গরম জামা-কাপড় সঙ্গে নিয়ে নেন। মহাকাশের কত উত্তাপ তা শুনলে আপনার চোখ কপালে উঠবে,— অনেকেই বলেন এই উত্তাপ বরফের চেয়ে প্রায় ২০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড কম! ঘাবড়ে যাবেন না—মহাকাশের কোনো উত্তাপ নেই। কোনো একটা পদার্থের মধ্যে সন্নিহিত তাপের পরিমাণকে আমরা থার্মোমিটার দিয়ে মাপতে পারি। কিন্তু শূন্য একটা পদার্থই নয়, তাই সেখানে উত্তাপের কোনো চিন্তা বা ধারণা আসতে পারে না। কোনো বস্তু যদি শূন্যের মধ্যে যায় তাহলে পরিবেশ অনুসারে তার উত্তাপ নিয়ন্ত্রিত হবে। সেই বস্তুর ওপর সূর্যের আলো পড়লে তার গ্রহণের ক্ষমতা অনুযায়ী উত্তাপ যাবে বেড়ে ; আবার আলো না পড়লে নিজস্ব তাপ মহাশূন্যে হারিয়ে সে হয়ে পড়বে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। সুতরাং এই পরিবেশে তাপ-নিয়ামক ব্যবস্থার মাধ্যমে শূন্যযানে মানুষের প্রয়োজনীয় উত্তাপ সৃষ্টি করতেই হবে।

এইবার চাপের কথায় আসা যাক। পৃথিবীতে বাতাস আমাদের শরীরে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে প্রায় ১৫ পাউণ্ড চাপ দিচ্ছে। দেহমধ্যস্থ এই চাপ বাইরের প্রচণ্ড চাপের সঙ্গে সমতাসম্পন্ন হওয়ায় আমরা স্বচ্ছন্দে এই পৃথিবীতে বাস করতে পারছি। মহাশূন্যে পরিভ্রমণের সময় বাইরের এই চাপ থাকবে না, অতএব ভিতরের রক্তচাপ অত্যধিক বৃদ্ধিলাভ করবে। কি সর্বনাশের কথা ভেবে দেখুন দিকি! এর পরে কি আপনি পৈত্রিক প্রাণটা খোয়াতে পৃথিবীর বাইরে যাবেন? শূন্যযানে অকসিজেনের আবহাওয়ায় কষ্টে-সৃষ্টে চলেছেন, হঠাৎ যানটি একটি উল্কার আঘাতে ফুটো হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে চাপ গেল কমে,—ফলে আপনিও ফেটে ফুটে

উড়ে গেলেন! শূন্যযানে চাপ কম হলেও মোটামুটি একটা সাম্য থাকবে, কিন্তু বাইরে তো তা নেই।

বিজ্ঞানীরা এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার জন্য বহুবিধ পরীক্ষা করে স্থির করেছেন এই অবস্থাতেও মানুষ ফেটে উড়ে যাবে না। পৃথিবীতে তাঁরা মানবদেহে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে সাড়ে সাত পাউণ্ড চাপ মাত্র আধ সেকেণ্ডের মধ্যে কমিয়ে নিয়ে দেখেছেন এতে মানুষের কোনোই ক্ষতি হয় না এবং জ্ঞান সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ থাকে। কেবলমাত্র কানটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, প্রাণের ভয় নেই। কালাদের কিন্তু ভারী মজা। এখন শূন্যযান ভেঙে যাওয়ায় অক্সিজেনের আবহাওয়া থেকে মহাকাশের অতল গর্ভে চাপের যে পতন হবে তা পরীক্ষিত চাপ পরিবর্ত্তনের অর্দ্ধেক, সুতরাং আশা করা যায় মানুষ এই পরিবর্তন সহ্য করতে পারবে এবং মারা যাবে অক্সিজেনের অভাবে। যে-দিক থেকেই হোক এটা খুব সুখবর হল না।

অক্সিজেনের আবহাওয়া কথাটা শুনে আপনারা বেশ অবাক হয়ে যাচ্ছেন তা বুঝতে পারছি। যদিও পৃথিবীতে অক্সিজেনই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে তবু পরিবেশ যদি কেবলমাত্র অক্সিজেনের হোত তাহলে আমরা দেহমধ্যস্থ অত্যধিক দহনক্রিয়ার ফলে মারা যেতাম। বাতাসের মধ্যে নাইট্রোজেন এনেছে সমতা এবং তারই উপস্থিতির কৃপায় প্রয়োজনীয় অক্সিজেন আমরা গ্রহণ করতে পারি। প্রতি ইঞ্চিতে বাতাসের ১৫ পাউণ্ড চাপের মধ্যে অক্সিজেনের দান মাত্র ৩ পাউণ্ড, সুতরাং শূন্যযানে যদি এমন আবহাওয়ার সৃষ্টি করা হয় যার চাপ প্রতি ইঞ্চিতে ৩ পাউণ্ড তাহলে ধরাপৃষ্ঠের মতোই অক্সিজেন গ্রহণ করা সম্ভব হবে। কিন্তু প্রশ্ন, পৃথিবীতে প্রতি ইঞ্চিতে ১৫ পাউণ্ড চাপের স্থলে মাত্র ৩ পাউণ্ড চাপের আবহাওয়ায় আমরা বাঁচব কিনা? দেখা গিয়েছে বেশ কিছুদিনের জন্য আমরা এই আবহাওয়ায় অক্লেশে থাকতে পারি।

নিঃশ্বাসে সৃষ্ট কার্বন-ডাই-অক্সাইডের গতি কি হবে? অনেকেই বলেন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অ্যালকালির সাহায্যে একে অপসারিত করা হবে। কিন্তু তাতেও হাঙ্গামা কম নয়। সবচেয়ে সুবিধা হয় যদি কোনো রকমে এই কার্বন ডাই-অক্সাইডকে ভেঙে অক্সিজেনকে আবার কাজে লাগাতে পারা যায়। সে তো গাছপালা না হলে হবে না—

শূন্যস্থানে সাজানো বাগান আপনি কোথায় পাবেন। নিজের প্রাণ বাঁচাতেই মানুষ পাগল আবার উদ্ভিদের পরিচর্যা,—অতএব এসব চিন্তা মাথায় না আনাই ভালো।

সম্প্রতি কোনো একটি বিশিষ্ট বিজ্ঞান বিষয়ক কাগজে দেখেছিলাম কোনো একজন বিজ্ঞানী প্রকৃতির এই প্রক্রিয়াকে রসায়নাগারে সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদিত করতে সমর্থ হয়েছেন। উদ্ভিদজগত থেকে তিনি ক্লেরোফিল বার করে নিয়ে তার সাহায্যে গবেষণাগারেই প্রস্তুত করেছেন শর্করাজাতীয় পদার্থ। এই ধরণের গবেষণা আরও সাফল্য-মণ্ডিত হলে আশা করা যায়, কেবলমাত্র ক্লোরোফিল বহন করেই শূন্যযানে অক্সিজেন উদ্ধার এবং পুনরায় তার ব্যবহার সম্ভব হবে। অবশ্য বর্তমানে অনেকেরই মতে সোডিয়াম পারঅক্সাইড দিয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইডকে গ্রহণ করা হবে; এবং এতে কেবলমাত্র কার্বন ডাই-অক্সাইডের হাত থেকেই আমরা রেহাই পাব না, উপরন্ত এই প্রক্রিয়া শূন্যযানে অক্সিজেনও সরবরাহ করবে।

ওজনবিহীনতা, তাপ, চাপ, খাদ্য, পানীয় এবং অক্সিজেনের কথা বললাম। এইবার মহাকাশের দিক থেকে মানুষ কি কি বিপদের আশঙ্কা করতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করা যাক। প্রথম হল উল্কাপিণ্ড। এদের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে শূন্যযানের জীবন সহজেই বিপন্ন হতে পারে। বড় উল্কা যার এক আঘাতেই শূন্যযান নীরব হয়ে যাবে তা খুবই বিরল। যেসব উল্কার ব্যাস কমবেশি আধইঞ্চি সাধারণভাবে তাদের সঙ্গেই হবে মোলাকাত,—একটা ছুঁয়েই আমাদের সেই পরিবেশের একমাত্র আশ্রয়কে ছেঁদা করে দেওয়া তাদের পক্ষে মোটেই বিচিত্র নয়। পার্ক স্ট্রীটের ওপর হঠাৎ কোনো দুর্ঘটনায় আপনার মোটর গাড়ির টায়ার ছেঁদা হয়ে গেলে লোকজন ভাড়া করে গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে গ্যারাজে নিয়ে যান। কিন্তু ঐ ঊর্ধ্বলোকে সেরকম কোনো সুবিধাই পাবেন না। অতএব একটা কিছু ব্যবস্থা আপনাকে এই পৃথিবী থেকেই করে যেতে হবে। পরিকল্পনা করা হচ্ছে শূন্যযানের সর্বাঙ্গ আরেকটি ধাতুর পাতের সাহায্যে মোড়া হবে এবং এই পাত ও যানের দেহের মধ্যে থাকবে অত্যন্ত উচ্চ-চাপ-সমন্বিত বাতাস। উল্কা

এসে মারল ধাক্কা, পাতের তলাকার বাতাস চাপে আরও সঙ্কুচিত হয়ে গেল। প্রথম আঘাতে সরে যাবার পরই ভিতরের বাতাসের চাপে পাতটি স্বস্থানে ফিরে এলো এবং আঘাতকারী পড়ল ছিটকে। মাঝে মাঝে এই ধাক্কাতে পাতটিও ফুটো হয়ে যাবে, কিন্তু বেশি বাতাস বেরিয়ে যাবার আগেই তৎক্ষণাৎ তাকে মেরামত করা হবে ঐ শূন্যযানে বসেই।

বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে পরীক্ষিত সত্য না হলে মানুষ কিছুই বিশ্বাস করে না। তাই উল্কা যে আমাদের ঠিক কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে তা এই পৃথিবীতে বসে বলা খুব মুশকিল। অতএব, নানান মুনির নানান মত। মোদ্দা কথা কি,—মহাশূন্যে আমাদের করতে হবে বুদ্ধির লড়াই, বিপাকে পড়লে অতিক্ষুদ্র উল্কাও ছেড়ে কথা কইবে না।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত মহাকাশ ভ্রমণের অন্যতম আতঙ্ক ছিল মহাজাগতিক রশ্মি। জীবনের পক্ষে ক্ষতিকারক যেসব রশ্মি সারা বিশ্বজগতে ছড়িয়ে আছে তারা বায়ুমণ্ডল ভেদ করে পৃথিবীতে আসতে পারে না। কিন্তু আকাশে এই সব রশ্মির সম্মুখীন আমাদের হতেই হবে। শূন্যযানের সর্বাঙ্গে ধাতুর আচ্ছাদন এই সব ক্ষতিকারক রশ্মিকে প্রতিহত করবে। কয়েক শ্রেণীর কাঁচও আছে যারা অন্যান্য ক্ষতিকারক রশ্মিকে প্রতিহত করতে পারে। কিন্তু বিপদ কেবল মহাজাগতিক রশ্মিকে নিয়ে। বায়ুমণ্ডল মহাজাগতিক রশ্মির এক প্রধান অংশকে পৃথিবী বক্ষে আসতে বাধা দেয়,—ঠিক সেইরকম একটি বাধার সৃষ্টির জন্য আমাদের শূন্যযানে প্রায় এক গজেরও বেশি চওড়া সীসার পাতের আচ্ছাদন নির্মাণ করতে হবে।

পৃথিবী থেকে ১২ মাইল উর্ধ্বে মহাজাগতিক রশ্মির পরিমাণ ধরা'ঠের প্রায় ৫০ গুণ বেশি, কিন্তু আরও উর্ধ্বে এই পরিমাণ কমে গিয়ে ১৫ গুণ দাঁড়ায়। কারণ কি জানেন, বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ পথে মহাজাগতিক রশ্মি বহু গৌণ বিকিরণ প্রণালীর মধ্যে দিয়ে নিজেকে বাড়িয়ে তোলে। ১৯৩৫ সালে ষ্টিভেনস্ এবং অ্যানডারসন নামক দুজন ভদ্রলোক বেলুনে চড়ে মহাজাগতিক রশ্মি যেখানে মহাশূন্যের চেয়ে অনেক বেশি, সেখানে কয়েকঘণ্টা বেশ খোশমেজাজে গল্পগুজব করে অক্ষত দেহে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেছেন। সুতরাং আমরা ধরে

নিতে পারি মহাশূন্যের মাত্র ১৫ গুণ বেশি মহাজাগতিক রশ্মি আমাদের বিশেষ একটা কিছু ক্ষতি করবে না। যাই হোক ঐ পরিমাণ রশ্মি বহুদিন ধরে মানবদেহ সহ্য করতে পারবে কিনা তা সন্দেহের বিষয়।

এত গণ্ডগোলের জন্যই অনেক বিজ্ঞানী চিন্তা করছেন, যারা যাত্রী বা গ্রহান্তরের কর্মী তাদের কোনো ওষুধের সাহায্যে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে নিয়ে যাওয়াই ভাল। পথের কষ্ট এতে অনেক লাঘব হবে এবং অন্য গ্রহে, উপগ্রহে অথবা মহাশূন্যে নির্মিত কৃত্রিম অঞ্চলে তাঁরা সতেজ দেহ ও মন নিয়ে কাজ করতে পারবেন। পথে আরও অনেক অজানা বিপদ ঘটতে পারে তা পৃথিবী থেকে আমরা কল্পনা করতে পারছি না, যে বন্ধু সেও হতে পারে শত্রু! কলম্বাস ভারতবর্ষ আবিষ্কারের জন্য যে নাবিকদের সহায়তা গ্রহণ করে সমুদ্রপথে যাত্রা করেছিলেন তারাই তাঁর বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছিল বিদ্রোহ, মহাশূন্য পরিভ্রমণে মানুষের ভাগ্যে কি আছে তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করবেন প্রথম অভিযাত্রী দল!

পথের খবর এইখানেই শেষ হল, রামধনুর উপসাগরে গিয়ে কি অবস্থায় আমরা পড়ব, আসুন তাই কল্পনা করি। অন্য গ্রহে যাবার চিন্তাটা বর্তমানে ছাড়ুন—সে বোধহয় আমাদের জীবনে হবে না। অবশ্য চাঁদে যাওয়াও হবে কিনা ঠিক নেই, কারণ বিজ্ঞানীরা বলছেন রাস্তা তৈরী করতে লাগবে আরও পঞ্চাশ বছর!

ভাবছেন চাঁদে গিয়ে প্রথমেই রামধনুর নৌকায় চড়ে দেশটা একবার ঘুরে দেখবেন, কেমন? সে স্বপ্ন আপনার বুদবুদের মতো মিলিয়ে যাবে, —জলই নেই তো সাগর আর উপসাগর! দুরন্ত ঠাণ্ডা দেশ, কলকাতা-চন্দ্রলোক কোম্পানির বিজ্ঞাপনে বিশ্বাস করে কি ঠকানটাই না ঠকেছেন!

টাইটা শক্ত করে বেঁধে নাবতে গেলেন, তৎক্ষণাৎ আপনাকে পরিয়ে দেওয়া হল বিশ্রী একটা পোশাক—অনেকটা ডুবুরীদের মতো! পিঠে অক্সিজেনের পাত্র আর তার সঙ্গে রেডিও-সেট। কথা বলতে হলেই ঐ বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে বলতে হবে। চাঁদে বাতাস নেই, পোশাকটা শূন্যতা আর ঠাণ্ডা সহ্য করবার জন্য ঠিক সেইভাবেই নির্মিত হয়েছে। দেখবার জন্য চোখের কাছেও কিছুটা স্থান থাকবে স্বচ্ছ। মহাশূন্যের

এই পোশাকটা নির্মাণ করতে শূন্যযান নির্মাণের চেয়ে কম মাথা খাটাতে হয় নি।

এইবার আপনি চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করলেন। বাব্বা, যানটাকে নামাতে কি কম কষ্ট হয়েছে। একে যানের প্রচণ্ড গতি, তার ওপর চন্দ্রের আকর্ষণ, চাঁদের বুকের ওপর আছড়ে ফেলে প্রায় শেষ করে দিয়েছিল আর কি? গতি কমিয়ে দিয়ে, আকর্ষণকে বিস্ফোরণের সাহায্যে বাধা দিয়ে তবে কোনো রকমে শূন্যযানকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো হয়েছে। চাঁদে বাতাসও নেই, আর রকেট এরোপ্লেনও নয় যে আস্তে আস্তে নামবে। এই অবতরণ আর একটা মস্ত বড় সমস্যা।

মানুষকে চাঁদে গিয়েই নির্মাণকার্য শুরু করতে হবে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য। চাঁদের উপনিবেশ থেকে আরও দূরে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে আবার অন্য গ্রহে যাবার চেষ্টা করতে হবে। অন্য গ্রহে কোনো প্রাণী থাকলে তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হবে। আর আমরা আন্ত ব্রহ্মাণ্ড শান্তি এবং মৈত্রীর প্রচারকার্য চালাব।

৫

এলেম নতুন দেশে। চন্দ্রপৃষ্ঠে ধীরে ধীরে অবতরণ করলো মানুষের শূন্যযান।

আকাশচারী গ্রহ উপগ্রহগুলির মধ্যে চন্দ্রই পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটে অবস্থান করছে ; দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে একেমাত্র কয়েক শো মাইলের মধ্যে আনা যায়, তাই বিজ্ঞানীরা দিনের পর দিন পর্য্যবেক্ষণ করে চন্দ্রের বিষয়ে অজস্র তথ্যাবলী লিপিবদ্ধ করে গেছেন। একদিন চন্দ্র হয়তো পৃথিবীর সঙ্গেই সংযুক্ত ছিল, তাই মনে হয় পৃথিবীর প্রায় সব মৌলিক পদার্থগুলিই ওখানে বর্ত্তমান,—তবে তাদের মিশ্রিত অবস্থিতি ধরাপৃষ্ঠের সঙ্গে ভিন্ন হতে পারে। পৃথিবী থেকে চন্দ্রের মাত্র এক পিঠ দেখা যায় তাই পর্যবেক্ষণের সাহায্যে এই পিঠের একটি সম্পূর্ণ মানচিত্র বিজ্ঞানীরা তৈরীর চেষ্টা করেছেন। অপর পিঠের হদিস যদিও আমরা জানি না তবু সাধারণভাবে মনে হয় তার প্রকৃতি ও পরিবেশ খুব একটা তফাৎ হবার কোন কারণ নেই। চাঁদে জল নেই—বাতাস নেই।

আয়তন পৃথিবীর পাঁচ ভাগের এক ভাগ এবং তার আকর্ষণও তাই পৃথিবীর ছ'ভাগের মাত্র একভাগ।

সমগ্র চন্দ্রপৃষ্ঠে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র গহ্বর আর পর্বতশ্রেণীর দুর্ভেদ্য ব্যবধান। বীভৎস এর চেহারা,—পর্বতসঙ্কুল চন্দ্রপৃষ্ঠে আগ্নেয়-গিরির তাণ্ডবলীলার সমস্ত স্বাক্ষর বর্তমান। প্রাণহীন এই বিশাল মরুভূমিতে জীবন ও সৌন্দর্য্যের চিহ্নমাত্র নেই। শূন্যচারী আগন্তুক দেহের আঘাতও চন্দ্রপৃষ্ঠে এই শোচনীয় পরিবেশ সৃষ্টির জন্য দায়ী। পৃথিবীর আবহাওয়া-মণ্ডলকে অগ্রাহ্য করে শূন্যে ভ্রমণকারী ক্ষুদ্র বস্তুপিণ্ডগুলি মাটিতে আঘাত করতে পারে না,—বাতাসের ঘর্ষণে তারা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। চন্দ্রের পরিবেশে যে অতি সামান্য আবহাওয়া-মণ্ডল আছে তার সাহায্যে শূন্যচারী দেহপিণ্ডসমূহের সম্পূর্ণ প্রতিরোধ কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।

চন্দ্রপৃষ্ঠে দিন-রাত্রির পরিবর্তন খুবই প্রকট,—আপনি সে দেশে গোধূলির সাক্ষাত পাবেন না। পৃথিবীর পনেরো দিন ধরে সেই দেশে একদিকে চলে দিন আর অপরদিকে রাত্রি। তাই সেখানে, হয় প্রচণ্ড গরম অথবা অত্যন্ত ঠাণ্ডা। দিনের বেলা সূর্যদেব যখন মাথার ওপর থেকে অগ্নিবর্ষণ করতে থাকেন তখন উত্তাপ প্রায় ১০০ ডিগ্রির কাছে ওঠে। দেবতা যখন সন্ধ্যাবেলা দিগন্তের দিকে হেলে পড়েন, ছাই আর ঝামা পাথরের গুড়োয় ভরা ধূলোর গভীর আবরণে ঢাকা চন্দ্র-পৃষ্ঠকে তিনি আর তত গরম করতে পারেন না তাই উত্তাপ আবার নাবতে থাকে। তারপর আসে দীর্ঘ রাত্রি—জমাট ঠাণ্ডার তীব্র প্রলেপে উত্তাপ বরফ-জমার প্রায় ১৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড্ তলায় নেবে আসে। এ কেবল ওপরের উত্তাপের কথা বললাম, চন্দ্রপৃষ্ঠের কয়েক ফুট নিচে গুহার অভ্যন্তরে দিনরাত্রির উত্তাপ কিন্তু সমান। জলের চিহ্নও চন্দ্রপৃষ্ঠে পাওয়া যায় না, মধ্যযুগের বিজ্ঞানীরা কেবল কল্পনার বশেই অন্ধকারাচ্ছন্ন অঞ্চলগুলির নাম দিয়েছেন—প্রশান্তির সাগর অথবা রামধনুর উপসাগর। চন্দ্রের ১৪ দিনব্যাপী রাত্রির অবসানে যখন প্রথম দেখা দেয় প্রভাতের আলো, তখন সামান্য শাদা কুয়াসার আবির্ভাব হয়তো ঘটে কিন্তু অবিলম্বেই তা মিলিয়ে যায় আকাশের বুকে। এই নতুন রাজত্বে

উদ্ভিদ আছে কিনা তাও এক বিরাট প্রশ্ন। কয়েকটি আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের পাশে কালো কালো অঞ্চল দেখা গিয়েছে যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রূপ ও অবস্থানের পরিবর্তন ঘটায় তাই মনে হয় এ সব স্থানে উদ্ভিদ থাকা বিচিত্র নয়। 'কোনো শ্রেণীর উদ্ভিদ হয়তো চন্দ্রপৃষ্ঠে জন্মাতে পারে,'—এই ধরনের চিন্তা অনেকেই করেন কিন্তু বিষয়বস্তুটি সঠিকভাবে প্রমাণ করা কারো পক্ষে এখনও সম্ভব হয় নি।

ব্যাপারটা আপনার কাছে দাঁড়াচ্ছে কিরকম? নতুন দেশে জল নেই, বাতাস নেই, প্রাণী নেই, উদ্ভিদ নেই,—আছে কেবল ধুলো ছাই, বিরাট গহ্বর আর পর্বতশ্রেণী। দিনের বেলা প্রচণ্ড গরমে মানুষ ঝলসিয়ে যাবে, আর রাত্রির জমাট ঠাণ্ডায় জীবনের স্পন্দন হবে স্তব্ধ। তাই এই দেশে বাস করতে হলে, বসতি স্থাপন করতে হবে মাটির তলায়, বিচরণ করবার সময় সর্বদাই পরতে হবে বিশেষভাবে নির্মিত বাতাস-নিরোধক মহাশূন্যের পোষাক। এই পোষাকের সঙ্গে আমরা অবশ্য শূন্যযানেই পরিচিত হয়েছি। চন্দ্রের অজানা অঞ্চলসমূহে অভিযান চালাবার জন্য শুঁয়াপোকার মতো যন্ত্রযান, উচ্চচাপযুক্ত এবং বাতাস নিরোধক করে ব্যবহার করতে হবে। মনে হয় এই শ্রেণীর যন্ত্রযান চন্দ্রপৃষ্ঠের যে কোনো দুর্গম স্থানেই যেতে সক্ষম হবে। চন্দ্রের আকর্ষণের স্বল্পতাই এই সব ভারি যন্ত্রপাতির ব্যবহারে মানুষকে সাহায্য করবে। বসতি স্থাপিত হবে ধীরে ধীরে—সময় লাগবে অনেক; প্রথমেই নির্মাণ করতে হবে এক জ্যোর্তিবিজ্ঞান গবেষণা-মন্দির যার সাহায্যে মহাকাশের বুকে শুরু হবে নতুন পর্যবেক্ষণ। অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহ বিজয়ের এই হল প্রথম প্রস্তুতি।

যাই হোক নতুন দেশে এসে আমরা কি করব সেই কথাই এবার ভাবা যাক। পৃথিবীর দুই সপ্তাহের সমান লম্বা চাঁদের একটি দিন; সেই দিনের একটি সুপ্রভাতে আমাদের শূন্যযান চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করেছে। যে স্থানটিতে আমরা অবতরণ করলাম তার নাম 'সিনাস্ রোরিস,'—একদিকে তার পাথর, লাভা এবং নুড়িতে আবৃত বিস্তৃত মরুভূমি সদৃশ অঞ্চল এবং অন্য তিন দিকে উচ্চ পর্বতশ্রেণী। সঙ্গে আর একটি যে মালবাহী শূন্যযান এসেছে সেটা আমাদের কাছ থেকে কয়েক

হাজার ফিট দূরে অবতরণ করলো। মহাশূন্যে যে সব বিপদের আশঙ্কা করেছিলাম তার সবকটিই চন্দ্রপৃষ্ঠে বর্তমান তাই বিশেষভাবে নির্মিত পোষাক পরিধান করে সবসময়েই অতি সাবধানের সঙ্গে আমাদের এখানে বিচরণ করতে হবে। অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে গেল কাজ। বিভিন্ন বিভাগের কর্মী, বিজ্ঞানী ও যন্ত্রবিজ্ঞানীরা শূন্যযান থেকে ক্রেন, নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি ও এই প্রাণীবির্বজিত অঞ্চলে বসতি স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম নামাতে লাগলেন। একদল কর্ম্মী ছুটে গেলেন মালবাহী যানটির কাছে—যত শীঘ্র সম্ভব তাকেও ভারমুক্ত করতে হবে। চন্দ্রপৃষ্ঠ সবসময়েই আকাশচারী দেহপিণ্ডসমূহের আঘাতে জর্জরিত, বাতাস না থাকার জন্য এখানে মহাজাগতিক রশ্মির আক্রমণও যথেষ্ট বেশি তাই এই খোলা প্রান্তরে বেশিক্ষণ অবস্থান করা মোটেই উচিত নয়। যে কোনো সময়েই একটি দেহপিণ্ড এসে জ্বালানির ভাণ্ডারে আঘাত করতে পারে, আর তাহলেই প্রচণ্ড একটি বিস্ফোরণ আমাদের সকলের জীবন বিপন্ন করবে। মালবাহী শূন্যযান থেকে তাড়াতাড়ি গাড়ি বের করে একদল বিজ্ঞানী আশ্রয়ের জন্য পর্বতপৃষ্ঠে একটি বিরাট ফাটলের সন্ধানে যাত্রা করলেন। গ্রহ-উপগ্রহের দুর্গম অঞ্চলসমূহ পরিভ্রমণ করবার জন্য এই যন্ত্রযানগুলি বিশেষভাবে নির্মিত হয়েছে। এর চাকার সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি বেল্ট যার গায়ে অজস্র গজাল লাগানো। চলবার সময় এই গজালগুলি মাটিকে ধরে কামড়ে; যে কোনো বন্ধুর পরিবেশেই আশা করা যায় এই শ্রেণীর উচ্চ-চাপযুক্ত ও বাতাসনিরোধক যন্ত্রযানের সহায়তায় আমরা অক্লেশে চলাচল করতে পারবো। বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই শক্তি-সংগ্রহের চেষ্টা শুরু করে দিয়েছেন, বড়ো বড়ো আয়না খাটিয়ে সূর্যালোককে কেন্দ্রীভূত করে গরম করা হচ্ছে পারাকে; পারার বাষ্পের টারবাইন চালিয়ে ব্যাটারীগুলিকে চার্জ করা হবে। যে জ্বালানির উপর নির্ভর করে আমরা পাড়ি দিয়েছি, চন্দ্রপৃষ্ঠে তার খরচ যত কম হয় ততই ভালো।

গাড়িগুলি লম্বায় প্রায় ২০ ফুট, পৃথিবীতে ওজন ১২টন হলেও চাঁদে এদের ওজন মাত্র ২ টনের কাছাকাছি। মহাশূন্যযানের মতো এই যন্ত্রযানও চলবে হাইড্রাজিন-অ্যালকোহল অথবা আণবিক শক্তির

সহায়তায়। ৬-৭ জন মানুষ এবং তাদের ২৪ ঘণ্টার মতো খাদ্য, পানীয় এবং অক্সিজেন এই গাড়িতে সঙ্গে নেওয়া যাবে। সব সরঞ্জামই স্বয়ংক্রিয়, আপনা থেকেই দহন ক্রিয়ার ফলে উৎপাদিত কার্বন ডাইঅক্সাইড অথবা মনোঅক্সাইডকে সম্ভব হলে ভেঙে পৃথক করে নেবে অথবা চন্দ্রপৃষ্ঠে দেবে ছেড়ে। দূরত্ব ও গভীরতা পরিমাপ করবার জন্য গাড়ির সঙ্গে থাকবে একটি রাডার এবং শূন্যযানের সঙ্গে এই গাড়ীর সর্বদাই সংযোগ থাকবে বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে।

আমাদের জিনিসপত্র সবই প্রায় নামানো হয়ে গেছে। অভিযাত্রী দল ফিরে এসেছেন চমৎকার একটি ফাটলের সন্ধান নিয়ে, বিরাট এই গহ্বরের মধ্যে নতুন দেশে মানুষের সর্বপ্রথম প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হবে। দেরি করার আর বিন্দুমাত্র সময় নেই, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হলো অপসারণ, যতো তাড়াতাড়ি পারা যায় নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। অবতরণের প্রথম ২৪ ঘণ্টা কোনো অভিযাত্রীই সামান্য বিশ্রাম নেবার অবসরও পাবেন না। আমাদের প্রধান কার্যালয়ের গভীরতা প্রায় ১০০ ফুট, সুতরাং এখানে শূন্যচারী দেহপিণ্ড সমূহের দ্বারা আঘাতের ভয় নেই। গহ্বরের মুখ দিয়ে মহাজাগতিক রশ্মিও যা ঢুকবে তার পরিমাণ খুবই কম, অন্যান্য দিকে পাথরের দেওয়াল আমাদের এই বিপদের হাত থেকে রক্ষা করবে। প্রধান কার্যালয়ে গিয়েই যন্ত্রবিজ্ঞানীরা তৎক্ষণাৎ একটি বেতার-কেন্দ্র স্থাপনের জন্য কাজ শুরু করে দেবেন, অবিলম্বে মানব-সভ্যতার কেন্দ্রভূমি পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। সমস্ত জিনিসপত্র ও যন্ত্রপাতি কার্যালয়ের মধ্যে সরিয়ে আনা হলো, অভিযাত্রীরা মালবাহী মহাশূন্যযানখানিও একেবারে খুলে ফেললেন। যাতে দুটি উদ্দেশ্যে সাধিত হয় তার জন্য এই শূন্যযানখানি এমনভাবে তৈরি যে অবতরণের পর একে খুলে ফেলে চমৎকার একটি বাতাস-নিরোধক বাড়ির কাঠামো নির্মাণ করা যাবে।

চন্দ্রপৃষ্ঠের ফাটলটি পরিষ্কার করে তৈরি হল নতুন দেশের নতুন বাড়ি। এই বাড়িতে বৈদ্যুতিক আলো আছে, ঘর ঠাণ্ডা ও গরম করবার ব্যবস্থা আছে, আছে সব রকমেরই সুখ ও সুবিধা। ঘর কিন্তু

মাত্র দুটি—একটি থাকবার ও শোবার জন্য, অপরটি গবেষণাগার। গবেষণাগারে নানারকম সংগৃহীত পদার্থ বিশ্লেষণ করা হবে, পর্যবেক্ষণ করা হবে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে,—দরকার হলে তোলা হবে তার ছবি। এই গবেষণাগারেরই একটি অংশে, প্রাপ্ত পদার্থ সমূহকে নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখবার আয়োজন আছে, সেখানে তাদের তেজস্ক্রিয়তা, অন্যান্য প্রকৃতি ও গুণাবলী বিচার করে দেখা হবে। বাস করবার ঘর এবং গবেষণাগারের মধ্যে সংযোগ থাকবে মাত্র ছোট্ট একটি রাস্তার মধ্যে দিয়ে এবং উভয়ের অক্সিজেন সরবরাহের জন্য সাজসরঞ্জাম হবে আলাদা। কারণ তা না হলে গবেষণাগারের দূষিত গ্যাস অপর ঘরে প্রবেশ করে পরিবেশকে বিষাক্ত করে দেবে। একটি খনিজ পদার্থের রাসায়ণিক বিশ্লেষণ করলেন, আপনাকে এর জন্য এ্যাসিড ব্যবহার করতে হল, ফলে সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের বাতাসে সঞ্চারিত হলো কিছু পরিমাণে এ্যাসিড বাষ্প। পৃথিবী হলে আপনি জানালা দরজা খুলে দিতেন, বাইরের বাতাসের সংস্পর্শে ঘরের আবহাওয়া নির্মল হয়ে উঠতো কিন্তু এই নতুন দেশে তা করতে পারবেন না। জানালা খুলে দিলেই ঘরের সব অক্সিজেনটুকু বাইরে পালিয়ে যাবে তাই আবহাওয়া বিশুদ্ধ করতে হবে অন্য ভাবে। যাই হোক বাতাস নির্মল করার জন্য যে কোন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ই গ্রহণ করা হোক না কেন, গবেষণাগারের মধ্যে সব সময়েই কিছু পরিমাণে বিষাক্ত বাষ্প থাকবে। সুতরাং স্বাস্থ্যরক্ষার খাতিরে কোন ক্রমেই বসবাসের ঘরের সঙ্গে গবেষণাগারে সংযোগ থাকা উচিত নয়। গৃহকর্মাদি এবং নতুন গৃহটি সংরক্ষণের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তার বেশির ভাগই সংগ্রহ করার চেষ্টা হবে সূর্যালোক থেকে।

বসতি স্থাপনের পর এইবার শুরু হলো অভিযান। আগেই বলেছি আমরা অবতরণ করেছি চন্দ্রের উত্তর মেরুর কাছে 'সিনাস রোরিস' নামক একটি অঞ্চলে। পাঠকেরা প্রশ্ন করতে পারেন, এতো জায়গা থাকতে আমরা এই অঞ্চলটি বেছে নিলাম কেন? কারণ, চন্দ্রের মেরুর নিকটবর্তী কোনো অঞ্চল, অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে মানুষ বাস করার পক্ষে উপযুক্ততম স্থান। প্রথম

অভিযান চালানো হবে 'সিনাস রোরিস'কে কেন্দ্র করে প্রায় হাজার বর্গমাইল স্থানে। কাছেই 'সিনাস ইরিডাম' নামক একটি উপসাগর। বিশেষ ধরণের যন্ত্রযান ও ট্রাকটর সম্বল করে আমরা তার দিকেই যাত্রা করব। ভূতত্ত্ববিদরা যন্ত্রপাতি নিয়ে গবেষণা শুরু করবেন,—চন্দ্রপৃষ্ঠে এত গহ্বর স্থষ্টি হওয়ার কারণ কি? বহিরাগত শূন্যচারী দেহসমূহ অথবা আভ্যন্তরিক বিস্ফোরণ,—কে তার ঘটিয়েছে এই দুর্দশা? বিজ্ঞানীরা গবেষণা শুরু করে দেবেন এখানে অতি সামান্য আবহাওয়া আছে কিনা এবং এই নতুন জগতের খনিজ সম্পদের মূল্য ও পরিমাণ কি? পৃথিবীর পরিচিত সব মৌলিক পদার্থ যদি এখানে উপস্থিত থাকে তাহলে তাদের সহায়তায় কৃত্রিম উপায়ে পৃথিবীর পরিবেশ স্থষ্টি করা কি সম্ভব?

চন্দ্রের জন্ম হল কি করে তা নির্ধারণ করা বিজ্ঞানীদের আর একটি প্রধান কাজ। সত্যিই কি বহুযুগ আগে উত্তপ্ত পৃথিবীর বুক থেকে অন্য কোন ক্ষমতাশালী তারকার দুর্ণিবার আকর্ষণে কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে চন্দ্রের স্থষ্টি করেছে, না চন্দ্র বহির্বিশ্বের কোনো দেহপিণ্ড, মহাকাশ পরিভ্রমণে বার হয়ে সে পৃথিবীর টান উপেক্ষা করতে না পেরে সজোরে তার বুকে আছড়ে প্রশান্ত মহাসাগরের স্থষ্টির প্রতিঘাতে মহাশূন্যে ফিরে যাবার সময় মায়ার বাঁধনে যুগ যুগ ধরে প্রদক্ষিণ করছে পৃথিবীকে। পদার্থ বিজ্ঞানীদের কয়েকজন চন্দ্রের চুম্বক-ক্ষেত্রের প্রকৃতি নির্ধারণ করতেও সচেষ্ট হয়েছেন। বেতার-বিজ্ঞানীরা এর মধ্যেই পৃথিবার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে ফেলেছেন, যা নতুন কিছু জানা যাচ্ছে, তা তৎক্ষণাৎ বেতারযন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীর বিজ্ঞানীমহলকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

পর্যবেক্ষণ, জরিপ ও মানচিত্র অঙ্কন এই তিন কাজ চলেছে সমান তালে। একজন বিজ্ঞানী চন্দ্রপৃষ্ঠের উত্তাপ নির্ধারণ করবার চেষ্টা করছেন। উত্তাপ অত্যন্ত উগ্র, কিন্তু চন্দ্রের প্রস্তর-গাত্রের মাত্র কয়েক ফুট নিচে উত্তাপ মোটামুটি সহনীয়। কারণ চন্দ্রপৃষ্ঠে একটি ধুলোর আবরণ আছে যা উত্তাপ পরিবহন করে না। এখানে খনিজ বা পাথর পাওয়া যাবে অনেক রকম যা পৃথিবীতে একেবারে দুষ্প্রাপ্য। জনৈক বিজ্ঞানীর মতে শূন্যভ্রমণকারী দেহপিণ্ডসমূহে এমন অনেক যৌগিক পদার্থ থাকে যা

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করবার সময় জ্বলে ছাই হয়ে যায় তাই পৃথিবীতে আমরা তা দেখতে পাই না। চন্দ্রের বুকে এই সব মহামূল্যবান পদার্থের সঙ্গে আমরা পরিচিত হবো। কিন্তু একে মহা-মূল্যবান বলবার সঙ্গত কারণ কিছু খুঁজে পাচ্ছি না! এখানে অফুরন্ত হীরের খনি পরিত্যাগ করে মানুষ যা থেকে জল তৈরী করার সম্ভাবনা আছে, সেই ধরনের যে কোনো অতি সাধারণ পদার্থকে মাথায় করে রাখবে। নতুন দেশে বিজ্ঞানীরা জল আবিষ্কার করবার আপ্রাণ চেষ্টা করবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কল্পনা করে নিতে দোষ কি যে চাঁদের বুকে অনেক গভীরে পাথরের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় সামান্য কিছু জল পাওয়া গেল ; বিজ্ঞানীদের তখন কিন্তু ঐ জলকে পৃথক ও পরিশ্রুত করবার জন্য এক বিরাট কারখানার পত্তন করতে হবে।

চন্দ্রের একটি দিন অর্থাৎ পৃথিবীর দু-সপ্তাহ ধরে চলবে এই অভিযান। বিজ্ঞানীরা তাঁদের সমস্ত জ্ঞান উজাড় করে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন নতুন দেশের প্রতিটি সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হতে। আমরা যখন চন্দ্রপৃষ্ঠে, পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানীরা তখন আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-সম্মেলন আহ্বান করে আমাদের প্রেরিত বেতারবার্তার মাধ্যমে চন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন। আমরা জানাচ্ছি আমাদের অসুবিধার কথা, নতুন কিছু আবিষ্কারের কথা,—তাঁরা সেই মহাসম্মেলনে আলোচনা করে ঐ বেতারেরই মাধ্যমে তাঁদের মতামত ও উপদেশ পাঠাচ্ছেন। প্রতি পদেই মানুষের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে নতুন দেশের নতুন সমস্যা-বলীর চলছে লড়াই।

দিন শেষ। এবার আমাদের ফেরার পালা। ইতিমধ্যে আরেক দল অভিযাত্রী এসে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করলেন। তাঁরা নতুন দেশের দীর্ঘ রাত্রির সঙ্গে পরিচিত হবার সঙ্কল্প নিয়ে এসেছেন। আমরা আমাদের গুরুদায়িত্ব এবং অভিজ্ঞতার সঞ্চয়টুকু দ্বিতীয় অভিযাত্রীদলের বিজ্ঞানীদের হাতে তুলে দিয়ে পৃথিবীর দিকে যাত্রা করলাম।

মহাশূন্যের এই নতুন জগতের প্রতিটি অঞ্চলে এবার জীবনের পদচিহ্ন পড়বে—গড়ে উঠবে মানব-সভ্যতার এক বিরাট উপনিবেশ।

৬

মানুষ এবার গ্রহান্তরের যাত্রী হতে চায়। চন্দ্রে উপনিবেশ স্থাপনের কথা পুরোনো হয়ে গেছে, আর মাত্র ৫০ বছর অপেক্ষা করতে পারলে আপনি সুযোগ সুবিধে মতো কর্ম্মস্থল থেকে ছুটি নিয়ে চন্দ্রপৃষ্ঠে তীর্থ এবং তার সঙ্গে স্বাস্থ্যোদ্ধার করে আসতে পারবেন। অতএব কবে যেতে পারবো মঙ্গল, বুধ অথবা শুক্রগ্রহে, সেই কথাই চিন্তা করা যাক্।

গ্রহান্তরের যাত্রার জন্য আমাদের এমন আরো কতকগুলি সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে যা চন্দ্রবিজয়ে মোটেই বিবেচনা করতে হয় নি। চন্দ্র ভ্রমণে কেবলমাত্র পৃথিবী ও চন্দ্রের আকর্ষণী শক্তির কথাই চিন্তা করতে হয়েছিল কিন্তু গ্রহান্তরের পথে এগুলির সঙ্গে সূর্যের আকর্ষণী শক্তির কথা অগ্রাহ্য করলে চলবে না। প্রশ্ন করতে পারেন, সূর্য্যের ক্ষমতা অসীম, সে পৃথিবীকে তার অসাধারণ আকর্ষণী শক্তি দিয়ে বেঁধে রেখেছে, কেন সে মানুষের চন্দ্রবিজয়ের প্রচেষ্টাকে এমন ভাবে শূন্যপথে অনাদর করলো? খুবই সত্যি কথা কিন্তু চন্দ্রবিজয়ে সূর্য্যের আকর্ষণী শক্তি আমাদের অতি সামান্য প্রভাবিত করে। কারণ, চন্দ্র ও পৃথিবীর উপর তার টান প্রায় সমান। তাই ধরাপৃষ্ঠ থেকে চন্দ্রযাত্রায় যে পথ অতিক্রম করতে হয় তার মধ্যে সূর্য্যের আকর্ষণী শক্তি শূন্যযানের প্রকৃতির উপর বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন ঘটায় না। গ্রহান্তরে যাত্রা করতে হলে আকর্ষণী শক্তির বিভিন্ন গ্রহের কক্ষপথ এবং মহাশূন্যের বিভিন্ন অঞ্চলের উপর আধিপত্যের কথা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করতে হবে। মহাশূন্যে যে কোন প্রবল আকর্ষণী শক্তিকেই একমাত্র প্রচণ্ড গতিশক্তির দ্বারা অগ্রাহ্য করা যায় কিন্তু এই প্রচণ্ডতম গতিশক্তির কল্পনাও বর্ত্তমান কালে মানুষের চিন্তাজগতের বাইরে। মানুষকে সর্ব্বদাই দেখতে হবে, কত অল্প শক্তির সহায়তায় পৃথিবী ও মহাকাশের অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের আকর্ষণের সঙ্গে তাল রেখে সংক্ষিপ্ততম পথে বাঞ্ছিত গ্রহে অবতরণ করা যায়। এই পথ বৃত্তাভাষক্ষেত্র,

অনুবৃত্ত অথবা অতিপরবলয় ;—সরল রেখায় গ্রহান্তরে যাত্রা করলে সুবিধা নিশ্চয়ই হয়, সময়ও লাগে অনেক কম কিন্তু এর জন্য শক্তির প্রয়োজন সহস্র গুণে বেশী।

মোটামুটি হিসাবে দেখা গিয়েছে, আমরা যদি প্রতি ঘণ্টায় ৩৬০০০ মাইল বেগে যাত্রা সুরু করি, তাহলে চন্দ্রে পৌছতে সময় লাগবে কমবেশী ১৪ থেকে ১৫ ঘণ্টা। লাগা উচিত অনেক কম কিন্তু শূন্যপথে গতিবেগের পরিবর্তন হওয়ার জন্যই আনুমানিক ১৪ ঘণ্টাই বিজ্ঞানীরা স্থির করেছেন। ভ্রমণের এই সময়ের পরিমাণ মঙ্গল এবং শুক্রের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা। পৃথিবী থেকে মঙ্গলগ্রহের দিকে প্রতি ঘণ্টায় কমপক্ষে ৪৫০০০ মাইল বেগে যাত্রা করতে হবে এবং এর জন্য সময় লাগবে প্রায় ২৫৯ দিন। শুক্র বিজয়ের জন্য কমপক্ষে গতিবেগের প্রয়োজন ঘণ্টায় ৫৮০০০ মাইল এবং সময় লাগবে কমবেশী ১৪৬ দিন। মঙ্গল অথবা শুক্রে যাবার জন্য যে পরিমাণ গতিশক্তির কথা আলোচনা করলাম, তার সাধনাতেই মানুষের কেটে যাবে বহু বছর। সুতরাং অন্য কোন গ্রহে যাবার চিন্তা করাও এখন বাতুলতা। সময় কতো লাগবে জানেন?— প্রয়োজনীয় গতি-শক্তিতে যদি যাত্রা করি, বৃহস্পতিতে পৌছতেই সময় লাগবে প্রায় ২ বৎসর ৯ মাস আর দূরান্তরের কোন গ্রহে অবতরণের সাধনায় আপনার আমার একটা জীবনই কেটে যেতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সরল রেখায় দূরান্তরের গ্রহে যাত্রা না করলে সেখানে পৌছবার চিন্তা না করাই ভাল। আগেই তো বলেছি, সরল রেখায় যাত্রা করা যায় একমাত্র প্রচণ্ড গতিশক্তির সাহায্যে ; আণবিক শক্তির সহায়তায় সেই গতি-শক্তি সৃষ্টি করবার জন্য মানুষকে হয়তো আরো কয়েক শতাব্দী অপেক্ষা করতে হবে।

বৃহস্পতি গ্রহের উপর কোন কঠিন আবরণ নেই, কোথায় অবতরণ করবে মানুষের শূন্যযান? প্রচণ্ড উত্তাপে শূন্যযান একেবারে গলে আরোহী সমেত ধ্বংস হয়ে যাবে ; তাই বৃহস্পতি বিজয়ের জন্য মানুষ খুব বেশী চিন্তিত নয়। বৃহস্পতিকে কেন্দ্র করে মহাকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে অনেকগুলি উপগ্রহ, স্বার্থ জড়িয়ে আছে সেইখানেই। এই উপগ্রহগুলির কয়েকটি বেশ বড়, এমন কি আয়তনে এদের মঙ্গলের

সঙ্গে তুলনা করা যায়। একবার যদি মানুষ কোনরকমে বৃহস্পতির কক্ষে পৌঁছতে পারে, তাহলে উপগ্রহগুলিতে যেতে কোনই অসুবিধা হবে না। বৃহস্পতির পর এক এক করে পথে পড়বে শনি, ইউরেনাস এবং নেপচুন—এদের সকলের অবস্থাই বৃহস্পতি গ্রহের মতো, অত্যন্ত ঘন একটি মিথেন এবং এ্যামোনিয়া গ্যাসের মিশ্রণ এই গ্রহগুলিকে রেখেছে ঢেকে এবং এই আবরণের প্রচণ্ড চাপে অন্তর্দেশের অন্যান্য গ্যাস সমূহ তরল পদার্থে পরিণত হয়েছে। তারা অত্যন্ত ঠাণ্ডা কিন্তু জমাট নয়, আর বৃহস্পতি এবং শনির বুকের উপর চলেছে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ! মানুষের শূন্যযান কোন দিনই এইগুলিতে অবতরণ করতে সমর্থ হবে বলে মনে হয় না, বৃহস্পতির উপগ্রহগুলির মতোন অন্যান্য গ্রহের উপগ্রহগুলির প্রতিই মানুষের লোভ। বিশেষ করে টিটান নামক শনির একটি উপগ্রহ যথেষ্ট বড় এবং এর একটি বেশ বিস্তৃত বায়ুমণ্ডল আছে যা উপগ্রহগুলির মধ্যে থাকে না। এই উপগ্রহগুলির বিষয়ে মানুষের জ্ঞান খুবই কম, কেবলমাত্র এদের আয়তন এবং ব্যাস সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা আছে। তাই মানুষ দূর থেকেই সুন্দর সুন্দর পৌরাণিক নাম দিয়ে দিন গুণছে, কবে তার শূন্যযান এদের পৃষ্ঠে অবতরণ করবে।

আমরা আলোচনার মধ্যে ২টি গ্রহকে এতক্ষণ বাদ দিয়ে গিয়েছি; তারা যথাক্রমে বুধ এবং প্লুটো। একটি স্বর্য্যের সবচেয়ে নিকটে এবং অপরটি সবচেয়ে দূরে কিন্তু প্রকৃতির দিক দিয়ে বিচার করলে এদের একদলেই ফেলা যায়। এরা মঙ্গল ও শুক্রসদৃশ গ্রহ; বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস অথবা নেপচুনের ন্যায় গ্যাস ও তরলপদার্থ মিশ্রিত প্রকাণ্ড শূন্যচারী দেহ নয়। বায়ুবিহীনতা এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য গুণাগুণ বিচার করলে বোধ হয় এদের চন্দ্রের সমগোত্রীয় বলা যেতে পারে। বুধ সর্ব্বদাই এক দিক স্বর্য্যের দিকে রেখে নিজ কক্ষপথে স্বর্য্যকে প্রদক্ষিণ করছে, তাই এর এক পিঠ প্রচণ্ড গরম এবং অন্য দিক সৌরজগতের মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে ঠাণ্ডা। এই ঠাণ্ডা এবং গরম পিঠ দুটি যেখানে এসে একত্রে মিশেছে, সেখানে উত্তাপ মোটামুটি সহ্য করা যায়। শুক্রগ্রহ বিজয়ের পর মানুষ যদি কোন দিন প্রচণ্ড উত্তাপকে অগ্রাহ্য করে বুধ-বিজয়ের জন্য অগ্রসর হতে সাহস করে তাহলে তাকে বুধের দুই

পৃষ্ঠের সংযোগস্থলে সহনীয় উত্তাপের মাঝে এসে নামতে হবে। প্লুটোও সূর্য্যের থেকে বহু দূরে অবস্থিত হওয়ার দরুণ প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। প্লুটো আবিষ্কৃত হয়েছে মাত্র ১৯৩০ সালে। সুতরাং এই গ্রহ বিষয়ে মানুষের জ্ঞান অত্যন্ত অল্প, তবে যা জানা গেছে তাতে এর আয়তন প্রায় পৃথিবীর সমানই হবে। প্লুটো বা বুধ কোনটাতেই কোন উপগ্রহের সন্ধান পাওয়া যায় নি।

বলা মুস্কিল, মানুষ আগে মঙ্গলগ্রহে যাবে, না যাবে শুক্রগ্রহে ? এই উভয় গ্রহ বিজয়েরই সময়কাল আশা করা যায় খুবই কাছাকাছি হবে। তবে বিজ্ঞানীরা মনে করেন, মঙ্গলগ্রহে যাওয়া শুক্রগ্রহে যাওয়ার চেয়ে অনেক বেশী লোভনীয়। বেশী দিন নয়, চন্দ্র বিজয়ের পরেই শুরু হবে মানুষের মঙ্গলগ্রহ বিজয়ের প্রস্তুতি। মঙ্গলগ্রহ বিজয়ের আকর্ষণ প্রধানতঃ দুটি, প্রথমটি হলো মঙ্গলে যাওয়া শুক্রে যাওয়ার চেয়ে সোজা এবং শক্তির খরচ কম ; অন্যটি, অনেকেরই বিশ্বাস মঙ্গলগ্রহে প্রাণী বাস করতে পারে।

একবার মঙ্গলপৃষ্ঠে অবতরণ না করতে পারলে এই গ্রহ বিষয়ে সঠিক ভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। দূরবীক্ষণের সাহায্যে এই গ্রহে জালের মতো কতকগুলি সরলরেখা আবিষ্কার করা গেছে, বিজ্ঞানী পার্শিভাল সোয়েলের মতে রেখাগুলি কোন বুদ্ধিমান প্রাণী কর্তৃক নির্মিত খাল ছাড়া কিছুই নয়। মঙ্গলপৃষ্ঠে মরুভূমির আক্রমণ রোধ করার জন্যই মঙ্গল-বাসীরা এই খাল খনন করেছেন। আবার অনেক বিজ্ঞানীই মঙ্গলে প্রাণীবাসের সম্ভাবনাকে একেবারে গল্প বলে উড়িয়ে দেন। সঠিক ভাবে মানুষ এ বিষয়ে কোন মতামতই প্রকাশ করতে পারে না। তবে আশা রাখে, একবার চন্দ্রে পৌঁছাতে পারলে সেখানে একটি পর্যবেক্ষণ মন্দির স্থাপিন করে নিখুঁত ভাবে মঙ্গলগ্রহের চেহারাটা পরীক্ষা করে দেখবে।

যাই হোক, ধরে নিলাম মঙ্গলগ্রহে মানুষের সমপর্য্যায়ের অথবা উন্নততর কোন প্রাণী বাস করে না কিন্তু ঐ গ্রহে যে উদ্ভিদ আছে, একথা প্রায় স্থির নিশ্চিত। চিহ্ন ও রঙ দেখে মঙ্গলগ্রহের উপরিভাগকে তিনটি নির্দ্দিষ্ট অংশে ভাগ করা চলে। প্রথমটি হলো সাদা বরফে ঢাকা মেরু অঞ্চল, দ্বিতীয়টি ঈষৎ লালচে মরুভূমি এবং তৃতীয় ছোট অঞ্চলটি নীলাভ

সবুজ সমুদ্র। যদিও মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর থেকে ছোট, তবু সমুদ্র না থাকার দরুণ এর স্থলভাগ প্রায় পৃথিবীর সমান বলা যেতে পারে। যে নীলাভ সমুদ্রের কথা এখন আলোচনা করলাম তাতে কিন্তু জল নেই এবং এই খানেই ঋতুর সাথে সাথে রঙের পরিবর্ত্তন দেখে বিজ্ঞানীরা মঙ্গলে উদ্ভিদ-জগতের সন্ধান পেয়েছেন। মঙ্গলগ্রহে যখন শীতকাল তখন এই অঞ্চলের রঙ থাকে খয়েরি, গরম বা বসন্তকাল এলেই মেরু প্রদেশের বরফ যায় গলে, বরফ-গলা সামান্য জল নেমে আসে সমুদ্রে, সমুদ্রের রঙ হয় নীলাভ সবুজ। অর্থাৎ মঙ্গলের মেরুপ্রদেশ একটি পাতলা বরফের আবরণে ঢাকা, গরমকালে ঐ বরফ-গলা অতি প্রয়োজনীয় জলের সংস্পর্শে এসেই মেরু থেকে সমুদ্র পর্য্যন্ত উদ্ভিদ্-জগতের আবির্ভাব ঘটে। মঙ্গলগ্রহে দুপুরবেলা বেশ গরম, আবার রাত্রিবেলা এর যে কোন স্থান পৃথিবীর মেরু প্রদেশের চেয়েও ঠাণ্ডা। এই আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয়। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, এই গ্রহের উদ্ভিদের প্রাণ কতো কঠিন! পৃথিবীর মতো প্রাণীর বাস মঙ্গলে অসম্ভব, কারণ এখানকার গভীর বায়ুমণ্ডল খুবই পাতলা, এবং এর প্রধান উপাদান হলো কার্ব্বণ ডাই অক্সাইড। অক্সিজেনের সন্ধান এই গ্রহে পাওয়া যায়নি কিন্তু এর লাল্‌চে রঙ দেখে অনেকেই মনে করেন, মঙ্গলগ্রহের উপরিভাগে প্রচুর পরিমাণে অক্সাইড জাতীয় যৌগিক পদার্থ বর্ত্তমান। সুতরাং মানুষকে যদি মঙ্গলগ্রহে বসতি স্থাপন করতে হয়, তাহলে হয় তাকে পৃথিবী থেকে অক্সিজেন বহন করে নিয়ে যেতে হবে, অথবা মঙ্গলে অবস্থিত ঐ যৌগিক পদর্থে থেকে অক্সিজেনকে পৃথক করে করতে হবে ব্যবহার। মঙ্গলগ্রহের দুটি উপগ্রহ আছে, কিন্তু তারা এতো ছোট যে, মঙ্গলে উপনিবেশ স্থাপনের পর ঐ উপগ্রহগুলিতে বসতির জন্য মনে হয় মানুষ আর শক্তি ব্যয় করবে না।

শুক্রগ্রহ মঙ্গলের চেয়ে পৃথিবীর নিকটে অবস্থিত, তবু এর সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান খুবই অল্প। ধুলোর একটা বিরাট মেঘ এই গ্রহটিকে একেবারে মুড়ে রেখে দিয়েছে এবং এই মেঘের মধ্যে জলের চিহ্নমাত্র নেই! সূর্য্যের দিকে অবস্থিত হওয়ায় পৃথিবী থেকে একে লক্ষ্য করার অসুবিধা যথেষ্ট বেশী; তার উপর আবার ধুলোর মেঘ! সব মিলিয়ে

শুক্রকে একটি রহস্যময় গ্রহ বলা যেতে পারে। যদিও উত্তাপ এখানে খুবই বেশী, তবু ধূলোর মেঘ গ্রহটিকে আগাগোড়া ঢেকে রাখার জন্য উত্তাপের মোটামুটি একটা সমতা আছে। জল বা অক্সিজেনের কোন চিহ্নই ঐ গ্রহে নেই, বর্ণালী পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, ঐ গ্রহ কার্ব্বণ ডাই অক্সাইডে একেবারে ভর্ত্তি। সুতরাং আয়তনে, ঘনত্বে এবং বহুবিধ প্রকৃতিতে শুক্র পৃথিবীর সমগোত্রীয় হলেও এখানে কোন প্রাণীর বাস কল্পনা করা যায় না। শুক্রের আঁহ্নিক গতির কথাও সঠিক ভাবে আমাদের জানা নেই। তবে মনে হয়; এই গ্রহের একটি দিন আমাদের পৃথিবীর কয়েক সপ্তাহের সমান। বিজ্ঞানীরা বলেন, লক্ষ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর চেহারাও বোধ হয় শুক্রের মতো ছিল, সময়ের সঙ্গে উত্তাপ কমে গিয়ে ধীরে ধীরে শুক্রও একদিন হয়তো আমাদের পৃথিবী মায়ের রূপ গ্রহণ করতে পারবে। উদ্ভিদ-জগতের হবে আবির্ভাব, তারা কার্ব্বণ ডাই অক্সাইডকে ভেঙে অঙ্গার গ্রহণ করে অক্সিজেনকে আবহাওয়ায় দেবে ছেড়ে—সুরু হবে প্রাণীজগতের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির খেলা। শুক্র, পৃথিবী আর মঙ্গল, গ্রহজগতের বিবর্ত্তনের তিনটি প্রতীক ; শুক্রের মধ্যে নিহিত রয়েছে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা, পৃথিবীর বুকে বর্ত্তমানের প্রাণচাঞ্চল্য, আর মঙ্গলের চোখে অতীতের নীরব সাক্ষ্য।

রহস্যময় রাজ্য শুক্রে শূন্যযানে একেবারে অবতরণ করা মোটেই নিরাপদ নয়। মহাশূন্য থেকে রাডারের সাহায্যে তার বায়ুমণ্ডলের অন্তর্দেশে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে শুক্রপৃষ্ঠের প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ে মোটামুটি একটা জ্ঞান অর্জ্জন না করে, সেখানে অবতরণ করলে মানুষ যে কোন অজানা বিপদের সম্মুখীন হতে পারে!

পরিশিষ্ট

মহাকাশ বিজয়ে মানুষের প্রচেষ্টার প্রথম ধাপ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। ইতিমধ্যেই রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা মহাশূন্যে দুটি কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছেন। প্রথম উপগ্রহটি ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর এবং দ্বিতীয়টি ৩রা নভেম্বর রকেটের সহায়তায় মহাকাশের বুকে স্থাপন করা হয়। উপগ্রহ দুটিকে নামকরণ করা হয়েছে যথাক্রমে প্রথম স্পুটনিক এবং দ্বিতীয় স্পুটনিক।

প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহের আকাশ পরিক্রমার সংবাদ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিজ্ঞান সভ্যতার জয়যাত্রার এই অসাধারণ সাফল্যে বিশ্ব-জগৎ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। নীরব সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা তাঁদের কার্য্যকলাপের কোন বিবরণই ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করেন নি বরং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের 'ভ্যানগার্ড' পরিকল্পনার কথা বিজ্ঞানী মহল জানতেন। তাই সকলেই অনুমান করেছিলেন আমেরিকাই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম এই অসাধারণ প্রচেষ্টায় ব্রতী হবেন। অবশ্য অনেক মার্কিণ বিজ্ঞানীই তাঁদের 'ভ্যানগার্ড' পরিকল্পনার সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে-ছিলেন।

সোভিয়েট রাশিয়ার সাফল্য দেখে বোঝা যায় তাঁরা বেশ এগিয়ে গেছেন। প্রথমেই আকাশে তুলেছেন ১৮৩ পাউণ্ড ওজন যা রাসায়নিক জ্বালানীর সহায়তায় মহাকাশের বুকে স্থাপন করা বিজ্ঞানীদের কল্পনার বাইরে ছিল। ১৮৩ পাউণ্ডই বা বলি কেন,—দ্বিতীয় স্পুটনিকের ওজন শোনা আছে আধ টনেরও বেশী, যে সব রাসায়নিক জ্বালানীর কথা মোটামুটি আমাদের জানা আছে তাদের সাহায্যে আধ টন ওজন উর্দ্ধাকাশে স্থাপন করা প্রায় এক অবাস্তব কাজ। রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপগ্রহ বিষয়ক তাঁদের গবেষণায় কোন বিস্তৃত বিবরণ এখনও প্রকাশ করেন নি, ঠিক কি ধরণের জ্বালানী যে তাঁরা ব্যবহার করেছেন তা নিয়ে পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহলে জল্পনা কল্পনার অন্ত নেই।

৫ই অক্টোবরের সংবাদপত্রে যখন সর্ব্বপ্রথম সোভিয়েট রাশিয়া কর্ত্তৃক মহাকাশের বুকে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনের কথা ঘোষিত হলো তখন হঠাৎ সকলেই এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের সন্দেহ ভঞ্জন হতে বেশী দেরী হলো না,—পৃথিবীর নানা অঞ্চলের গবেষণাগারে বিজ্ঞানীরা এর সন্ধান পেতে লাগলেন। উপগ্রহটি থেকে স্বয়ংক্রিয় বেতার যন্ত্রের সাহায্যে সঙ্কেত আসতে লাগলো ব্লিপ ব্লিপ্। জানা গেল মানুষে গড়া এই প্রথম উপগ্রহটি পৃথিবীর বুক থেকে ৫৬০ মাইল উঁচুতে ঘণ্টায় প্রায় ১৮ হাজার মাইল গতিতে প্রতি ৯৫ মিনিটে একবার করে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। এই উপগ্রহের ওজন প্রায় ১৮৩ পাউণ্ড,—ব্যাস প্রায় ২৩ ইঞ্চি। দুটি স্বয়ংক্রিয় বেতার সঙ্কেত প্রেরক যন্ত্র ঐ উপগ্রহটি থেকে সর্ব্বদাই ১৫ এবং ৭.৫ মিটারে পৃথিবীতে সঙ্কেত পাঠাচ্ছিল। উপগ্রহটিতে শক্তি সরবরাহ করছিল রাসায়নিক ব্যাটারী, প্রায় দিন কুড়ি বাদে রাসায়নিক ব্যাটারীর শক্তি ফুরিয়ে যাবার ফলে বেতার সঙ্কেত আসা বন্ধ হয়ে গেছে। মহাকাশের বুকে উপগ্রহটি প্রেরণ করে, বেতার সঙ্কেতের মাধ্যমে রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা আশা করা যায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছেন। উর্দ্ধে বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব, মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাব ও মহাকাশের অন্যান্য সংবাদসমূহ সংগ্রহ না করে, সেখানে মানুষের দৈহিক উপস্থিতি এবং অন্যান্য যে কোন অভিযান চালানো মোটেই নিরাপদ নয়।

প্রথম স্পুটনিকটি মহাকাশের বুকে একটি ত্রিস্তর রকেটের সাহায্যে স্থাপন করা হয়। পরে দেখা যায়, ত্রিস্তর রকেটের শেষ পর্য্যায়টি উপ-গ্রহটির আগে আগে আর একটি কৃত্রিম উপগ্রহের রূপ ধরে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে! রকেটের এই অংশটি খালি চোখে দেখা যায়। পীতবর্ণের একটি মৃদু উজ্জ্বল তারার মতো এটি আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যায় চলে। স্পুটনিকের গতি যাচ্ছে কমে, ধীরে ধীরে সে এগিয়ে আসছে পৃথিবীর দিকে। ঠিক কতোদিন এটি আর মহাকাশের বুকে বিরাজ করবে তা নির্ভুলভাবে বলা সম্ভব নয়।

৩রা নভেম্বর, মহাকাশের বুকে জীবন্ত প্রাণীসহ দ্বিতীয় স্পুটনিকের

আবির্ভাব হলো। এই উপগ্রহটি ওজন প্রায় আধ টন, এটি পৃথিবীর ৯৩০ মাইল উর্দ্ধে প্রতি ১০২ মিনিটে প্রায় ১৮ হাজার মাইল গতিতে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। এই স্পুটনিকের মধ্যে অবস্থান করছে একটি কুকুর—জীবদেহের উপর মহাকাশের পরিবেশের কি প্রভাব তাই জানবার জন্য বিজ্ঞানীরা এই জীবন্ত প্রাণীটিকে মহাশূন্যে প্রেরণ করেছেন। কুকুরটি ছাড়াও এই উপগ্রহে মহাজাগতিক রশ্মি, উর্দ্ধাকাশের তাপ, চাপ প্রভৃতি বিষয়ে নানাপ্রকার তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য নানারকম যন্ত্রাদিও পাঠান হয়েছে। দ্বিতীয় স্পুটনিক থেকেও ৭·৫ এবং ১৫ মিটারে অবিরাম বেতার সঙ্কেত পাঠাবার আয়োজন ছিল কিন্তু ৬-৭ দিন পরেই রাসায়নিক শক্তি সরবরাহ শেষ হয়ে যাওয়াতে সঙ্কেত প্রেরণ বন্ধ হয়ে গেছে। কুকুরটিকে একটি বাক্সে বিশেষভাবে বন্ধ করে, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে রাখা হয়েছে! কুকুরটির সঙ্গে কয়েক-দিনের খাদ্যও দেওয়া হয়েছিল। শূন্যলোকে নানা পরিস্থিতিতে ঐ জীবের দেহের কার্য্যকলাপের বিবরণ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মারফৎ লিপিবদ্ধ করবার আয়োজনও দ্বিতীয় স্পুটনিকে আছে।

কুকুরটিকে মহাশূন্যে পাঠিয়ে যেসব তথ্যাবলী সংগৃহীত হচ্ছে তা মানুষের গ্রহে উপগ্রহে যাত্রার পথের এক প্রধান সম্বল হবে। কিছুদিন পূর্ব্বেই সোভিয়েট রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা আরও দুটি কুকুরের সঙ্গে এটিকেও বাইরের পরিবেশের সহিত সংযোগশূন্য রুদ্ধ টিউবের মধ্যে পুরে রকেটের সহায়তায় মহাকাশের বুকে প্রায় ৭০-৮০ মাইল উঁচুতে ঘুরিয়ে এনেছিলেন। আর একটি পরীক্ষায় খোলা টিউবের মধ্যে বসে এই কুকুর তিনটিই মহাকাশের জন্য বিশেষভাবে নির্ম্মিত পোষাক পরিধান করে ঐ উচ্চতার মধ্যেই ঘুরে এসেছে। এতেও তাদের বিশেষ কোন ক্ষতি হয়নি। এখন ৯৩০ মাইল উঁচুতে ঐ জীবের দেহে কি পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় তা জানবার জন্য সমগ্র পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহল উন্মুখ হয়ে আছেন।

শোনা যাচ্ছে লাইকা শ্রেণীর লোমশ একটি কুকুরকে পাঠান হয়েছে। কুকুরটি বর্ত্তমান ভ্রমণের জন্য বিশেষভাবে শিক্ষিত,—আইভান-প্যাভলোকএর কনডিশন্‌ড রিফ্লেক্স থিওরী অনুযায়ী তাকে শিক্ষা দেওয়া

হয়েছে। উপগ্রহটির মধ্যে খাদ্যের রেশন বর্ত্তমান, শিক্ষিত কুকুরটি যখন তখন তার খাবার খাবে না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে যখন ঘণ্টা বাজবে তখনই কেবল সে খাদ্য গ্রহণ করবে। কুকুরটির সঙ্গে তার ফুসফুস ও হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া এবং রক্তের চাপ মাপবার এবং তাকে নথীভুক্ত করবার আয়োজন আছে।

লাইকাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা যাবে কিনা তার আলোচনায় পৃথিবীর বিজ্ঞানীমহল এখন সরগরম। কুকুরটিকে ফিরিয়ে আনতে পারলে মহাশূন্য বিজয়ের একটি বিরাট সমস্যার ঘটবে সমাধান। এরপর মানুষ তাহলে নিজে কৃত্রিম উপগ্রহের সঙ্গে মহাকাশে যাত্রা করতে পারবে। কিন্তু কুকুরটিকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনা সম্ভব না হলে মহাকাশের বুকে মানুষের নিজের যাত্রার সময় যাবে পিছিয়ে। সুতরাং বিজ্ঞান সভ্যতার জয়যাত্রার ইতিহাসে কুকুরটির নিরাপদ প্রত্যাবর্ত্তন নিঃসন্দেহে যে এক স্মরণীয় অধ্যায়ের দাবী করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয় স্পুটনিক আকাশে ওঠার পর আট দিন কেটে গেছে। প্রথমে সোভিয়েট রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেছিলেন লাইকা নিরাপদে পৃথিবীতে অবতরণ করবে কিন্তু এখন তাঁরা নীরব। সমস্ত দুনিয়ায় প্রচারিত হচ্ছে নানাপ্রকার পরস্পর বিরোধী সংবাদ। কেউবা জানাচ্ছেন লাইকা নিরাপদে ইতিমধ্যেই অবতরণ করেছে আবার কারো কারো মতে মহাকাশেই তার ঘটেছে মৃত্যু। লাইকার সঠিক সংবাদ আমরা জানি না, তবে মনে প্রাণে কামনা করি সে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে এসে মানব-সভ্যতার জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করুক। হতভাগ্য লাইকার নিরাপদ প্রত্যাবর্ত্তন না ঘটলে মানুষের এই বিজ্ঞান গবেষণার সম্পূর্ণ সাফল্যের জন্য আবার কোন প্রভুভক্ত কুকুরকে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে মহাশূন্যে যাত্রা করতে হবে।

এখন পর্য্যন্ত সামান্য যেটুকু সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছি তাই সংক্ষেপে পরিবেশন করলাম। দু'একদিন আগের সংবাদে প্রকাশ মার্কিণ বিজ্ঞানীরা কোন একটি পদার্থকে রকেটের সহায়তায় মহাশূন্যে পাঠিয়ে তাকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছেন। সংবাদপত্রে

প্রকাশিত হয়েছে রাশিয়ার তৃতীয় স্পুটনিকের আকাশ পরিক্রমার সময় আসন্ন। এই কৃত্রিম উপগ্রহটির ওজন হবে প্রায় এক টন! বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই ভবিষ্যদ্বাণী করতে সুরু করেছেন আগামী পাঁচ বছরের মধ্যেই চন্দ্রপৃষ্ঠে টেলিভিসন সমন্বিত যন্ত্রাদি অবতরণ করাতে মানুষ সমর্থ হবে, এবং টেলিভিসনের মারফৎ পৃথিবীর সঙ্গে চন্দ্রের ঘটবে সংযোগ। অনেক বিজ্ঞানী আবার অনেক বেশী আশা মনে মনে পোষণ করছেন,—কিছু-দিনের মধ্যে মানুষই হয়ত চন্দ্রে পৌঁছোতে পারে? শোনা যাচ্ছে কোন কোন দেশে ইতিমধ্যেই চন্দ্রের এবং মঙ্গল গ্রহের জমি বিক্রয় সুরু হয়ে গেছে। অনেকে আবার মনে করেন এখনই চন্দ্রে রকেট প্রেরণ করবার ক্ষমতা রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের আছে।

অতএব আপনারা যখন আমার এই রচনা পড়বেন তখন মানুষের মহাকাশ বিজয়ের প্রচেষ্টা আরও অনেক অগ্রগামী হয়ে যাবে। হয়তো লাইকা, অথবা পরে তার যে স্বজাতি উর্দ্ধাকাশে যাবে তার ঘটবে নিরাপদ প্রত্যাবর্ত্তন। রাশিয়া আরো ভারী, আরো বড় কৃত্রিম উপগ্রহ অনেক বেশী উঁচুতে স্থাপন করবে,—প্রকাশিত হবে মহাশূন্য বিজয়ে আমেরিকার বিজ্ঞানীদের নতুন কার্য্যকলাপ। আশা হয়, রাশিয়া আর আমেরিকার বিজ্ঞানীদল একত্রে আগামী যুগে গ্রহে উপগ্রহে মানুষের জয়যাত্রার নিশান প্রতিষ্ঠিত করতে সঙ্ঘবদ্ধ হবেন। আমরা সেই সুদিনের প্রতীক্ষায় রইলাম।

গ্রহ ও উপগ্রহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

নাম	পৃথিবী থেকে দূরত্ব (মাইল)	ব্যাস (মাইল)	বায়ুমণ্ডলী	জীবনের সম্ভাবনা
বুধ	৫০,০০০,০০০	৩,০০০	নেই	নেই
শুক্র	২৫,০০০,০০০	৭,৬০০	আছে	? ?
চন্দ্র	২৩৮,৮৫৭	২,১৬০	নেই	নেই
মঙ্গল	৩৫,০০০,০০০	৪,২২০	আছে	আছে
বৃহস্পতি	৩৬৭,০০০,০০০	৮৯,০০০	আছে	নেই
শনি	৭৪৪,০০০,০০০	৭৫,০০০	আছে	নেই
টিটান(শনির উপগ্রহ)	৭৪৪,৭৬০,০০০	৩,৫০০	আছে	নেই
ইউরেনাস	১,৬০৬,০০০,০০০	৩১,০০০	আছে	নেই
নেপচুন	২,৬৭৭,০০০,০০০	২৮,০০০	আছে	নেই
প্লুটো	৩,২০০,০০০,০০০	৬,৩০০(?)	নেই	নেই

রত্নসাগর গ্রন্থমালা